মেসেজ বোর্ড • মনে রাখার মতো • সবজান্তা • ছবির ধাঁধা

আনন্দমেলা

২০ এপ্রিল ২০১৪

অন্য কমিক্স

দস্যি ডেনিস • অরণ্যদেব

খেলাধুলো

ফর্মের খোঁজে সাইনা

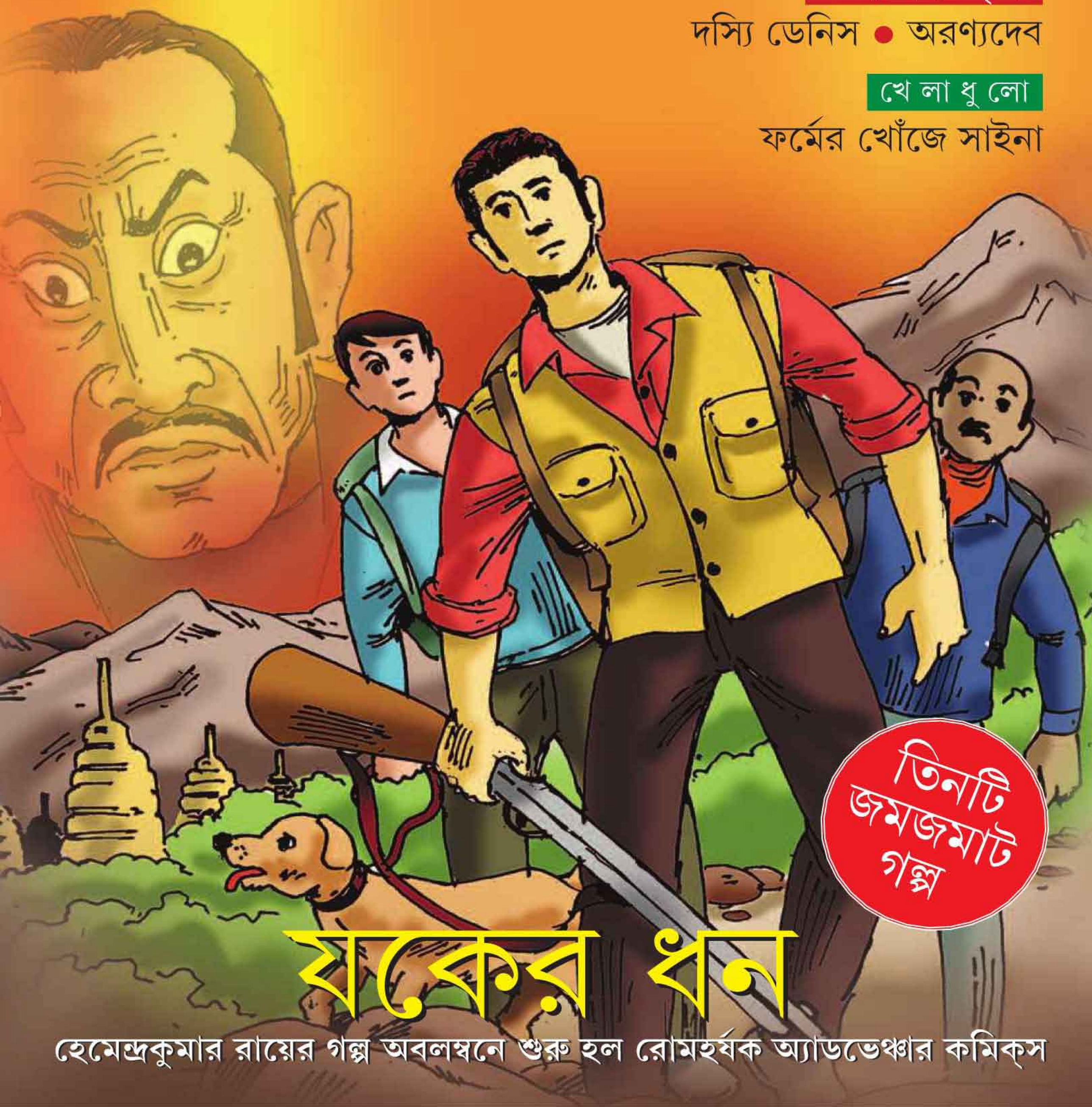

তিনটি জমজমাট গল্প

যকের ধন

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গল্প অবলম্বনে শুরু হল রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

আনন্দমেলা

সূচিপত্র

৩৯ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ২০ এপ্রিল ২০১৪ ৬ বৈশাখ ১৪২১

আনন্দমেলা এবার ওয়েবসাইটে: www.anandamela.in

নিয়মিত বিভাগ

খুদে প্রতিভা ৪
অনুপ্রেরণা ৬
মেসেজ বোর্ড ২৬
সায়েন্স সঙ্গী ২৭
মজার ঝাঁপি ৩৮
মনে রাখার মতো ৩৯
ফারাক পাও হদিশ দাও, সুদোকু ৪৪
সবজান্তা, নিজের হাতে ৪৫
শব্দসন্ধান, ছবির ধাঁধা, পেটে খিল ৪৬
করবে কী ৪৭
নতুন খেলা ৫০

কমিক্স

দস্যি ডেনিস ৫
অরণ্যদেব ২৮

প্রচ্ছদ কাহিনি ৭

যকের ধন

শুরু হল হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গল্প অবলম্বনে নতুন ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স।
ছবি এবং চিত্রনাট্য : সৌরভ মুখোপাধ্যায়

খেলাধুলো

ফর্মের খোঁজে সাইনা

অচ্যুত দাস ৪৮

ছোট-ছোট খেলা

চন্দন রুদ্র ৪৯

গল্প

হোম ডেলিভারি
শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২

অভিযান চিত্রকূট
বাসন্তী গঙ্গোপাধ্যায় ৩০

টুংটাংয়ের দুপুর
সাথী সেনগুপ্ত ৪০

প্রচ্ছদ: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত

দাম: পনেরো টাকা

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড কলকাতা ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা।
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুদে প্রতিভা

“গরমের দুপুরে দরজায় কড়া নাড়ল একজন অদ্ভুত আইসক্রিমওয়ালা। সে বলল, তার আইসক্রিমটা খেলে আর একটুও গরম লাগবে না ...” আঁকা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম পুরস্কার

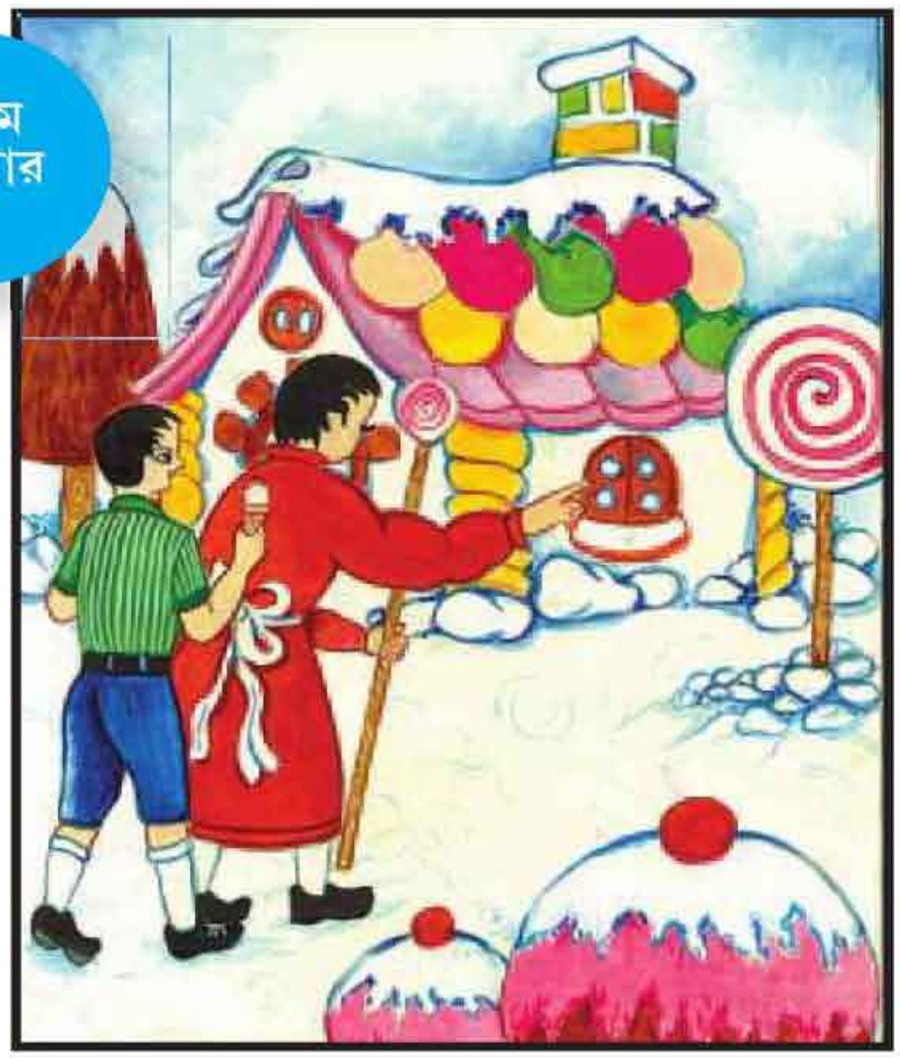

নচিকেতা সাহা
অষ্টম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠ, বাঁকুড়া।

দ্বিতীয় পুরস্কার

রৌহিণ দত্ত মন্ত্রানি
তৃতীয় শ্রেণি, সল্টলেক সি এ স্কুল, কলকাতা।

এবারের প্রতিযোগিতা চোখের সামনে গাছ থেকে খসে পড়ল একটা পাতা। তুলে দেখলে তাতে লেখা, এই পাতাটা হাতে ঘষলে অদৃশ্য হওয়া যায়। তুমি তাই করলে। তারপর? **যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, তারাই লিখে পাঠাও ২৮ এপ্রিলের মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম ও ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা পরের সংখ্যায় ছাপব। ঠিকানা: ‘খুদে প্রতিভা’, ‘আনন্দমেলা’, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১**

AMARBOI.COM

আরও যারা ভাল এঁকেছে

সঞ্চারী ঘোষাল
অষ্টম শ্রেণি, নৈহাটি কাত্যায়নী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

গার্গী ভট্টাচার্য
সপ্তম শ্রেণি, আদি মহাকালী পাঠশালা, কলকাতা।

তৃতীয় পুরস্কার

শ্রীময়ী মুখোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি, আদিত্য আকাদেমি সিনিয়র সেকেন্ডারি, বারাসাত।

কৌশিকী চন্দ
অষ্টম শ্রেণি, আলিপুরদুয়ার নিউটাউন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

চন্দ্রাপীড় সর
ষষ্ঠ শ্রেণি, বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপ্রেরণা

অবিশ্বাস্য এক গল্পের নায়ক

মিষ্টির দোকানে রুটি বেলে তারপর স্কুলে যেতেন। চাকরি ছেড়ে মাত্র ছ'জন কর্মী নিয়ে শুরু করেছিলেন ব্যবসা। আর নানা ওঠাপড়া পেরিয়ে সেই চন্দ্রশেখর ঘোষ এখন ব্যাঙ্কের মালিক হতে চলেছেন।

কিছু মানুষ এমন থাকেন, যাঁদের জীবন নিয়ে অনায়াসে উপন্যাস কিংবা সিনেমা করা যেতে পারে। চন্দ্রশেখর ঘোষ তেমনই একজন। ত্রিপুরার আগরতলার কাছে বিশালগড়ে জন্ম চন্দ্রশেখরবাবুর। বাবার ছিল এক মিষ্টির দোকান। সেই দোকান থেকে যা আয় হত, তাই দিয়েই কোনওমতে চলত তাঁদের সংসার। ফলে প্রতিদিন সকালে উঠে মিষ্টির দোকানে গিয়ে রুটি বেলে তারপর তিনি স্কুলে যেতেন। এই ভাবে জীবন শুরু করে এখন, এই ৫৩ বছর বয়সে, চন্দ্রশেখরবাবু একটি ব্যাঙ্ক খুলতে চলেছেন। ২৫টি বড়-বড় কোম্পানিকে টপকে যে দুটো কোম্পানি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক খোলার ছাড়পত্র পেয়েছে, তার একটি হল চন্দ্রশেখরবাবুর 'বন্ধন'। আর এই ব্যাঙ্কের সদর দফতর হবে কলকাতা।

কিন্তু কীভাবে চন্দ্রশেখরবাবু দারিদ্র এবং নানা প্রতিবন্ধকতাকে ঠেলে এই জায়গায় উঠে এলেন? সেই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে তাঁর ফেলে আসা দিনগুলোর ভাঁজে-ভাঁজে। চন্দ্রশেখরবাবুর বাবার আর্থিক অনটন থাকলেও তিনি ছেলেকে ভাল ভাবে লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে কোনও কার্পণ্য করেননি। বাবার সাহায্য এবং নিজের অদম্য জেদের জন্য চন্দ্রশেখরবাবু বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। এর পরই বিপর্যয় নেমে আসে তাঁর জীবনে। প্রায় আচমকা বাবা মারা গেলেন। পুরো পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ল চন্দ্রশেখরবাবুর উপর। অগত্যা তিনি বেসরকারি সংস্থায় সামান্য মাইনের চাকরি নেন। পনেরো বছর চাকরি করেছিলেন চন্দ্রশেখরবাবু। তার মধ্যে চাকরি পালটেছেন কুড়িবার। আর এই সব চাকরির দৌলতে তিনি গ্রামের গরিব মানুষদের কাছাকাছি আসেন। জানতে পারেন তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা। পনেরো বছর পর চাকরি ছেড়ে চন্দ্রশেখরবাবু নেমে পড়লেন ক্ষুদ্রঋণের ব্যবসায়। সেটা ২০০১ সাল। চন্দ্রশেখরবাবু স্রেফ দু'জন কর্মী নিয়ে সেই ব্যবসা শুরু করেন। এখন ভারতের ২২টি রাজ্যে বন্ধনের অফিস দু' হাজারের বেশি। যে সব গরিব মানুষকে বড়-বড় ব্যাঙ্কগুলো ঋণ দিতে চায় না, তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় চন্দ্রশেখরবাবুর বন্ধন। এই মুহূর্তে ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ বন্ধনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে উপকৃত হয়েছেন। বন্ধন এ দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা।

ভারতের যা আইন, তাতে এতদিন বাজার থেকে সরাসরি কোনও টাকা তুলতে পারত না বন্ধন। মানে, গরিবদের টাকা ধার দেওয়ার জন্য বন্ধনকে ঋণ নিতে হত ব্যাঙ্ক কিংবা ওই ধরনের অন্য সংস্থা থেকে। এবার বন্ধন যদি নিজেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হয়ে যায়, তা হলে আর অন্য ব্যাঙ্কের থেকে টাকা ধার নেওয়ার সমস্যা থাকবে না। মানুষ বন্ধন ব্যাঙ্কে সরাসরি টাকা জমাতে পারবেন। সেই টাকা থেকেই ঋণ দেওয়া যাবে দুঃস্থ মানুষজনদের।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছাড়পত্র পাওয়ার পর চন্দ্রশেখরবাবুর কাছে আসছে একের পর-এক শুভেচ্ছাবার্তা। তার মধ্যে এমন কয়েকটি ব্যাঙ্কের শুভেচ্ছাবার্তাও রয়েছে যারা, একসময় চন্দ্রশেখরবাবুকে ঋণ দিতে চায়নি। ব্যবসায় নামার ১৩ বছরের মধ্যে এমন উত্থানের নজির এ দেশে বেশি নেই। তবে চাকরির নিরাপদ জীবন ছেড়ে ব্যবসার মাঝসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে এমন সাফল্য কিন্তু চন্দ্রশেখরবাবুকে আত্মতুষ্ট করতে পারেনি। এখন তিনি ব্যস্ত ব্যাঙ্ক হিসেবে বন্ধনকে আরও বড় জায়গায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে।

সিজার বাগচী

ফোটো: কিশোর রায়চৌধুরী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু হল রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

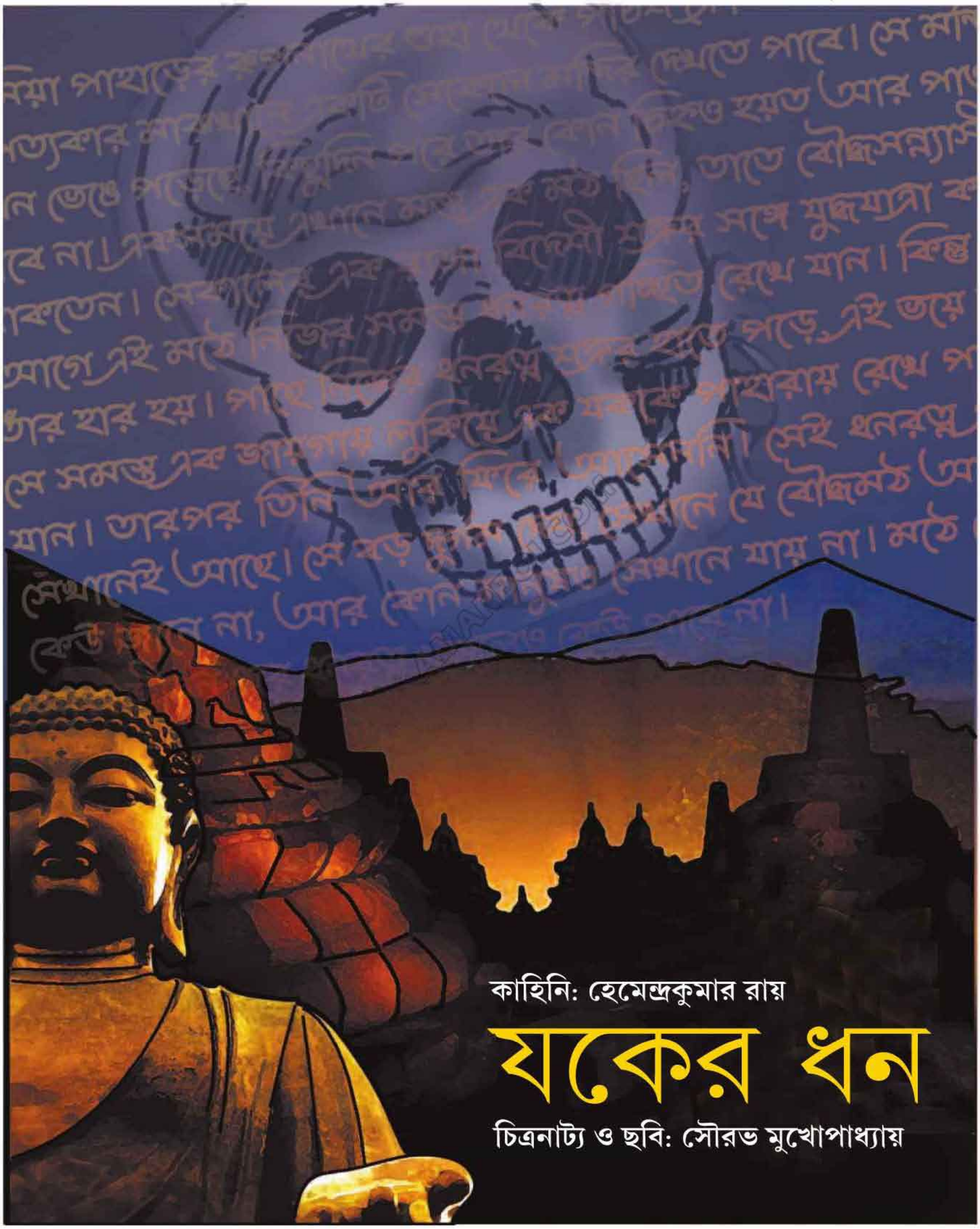

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়

যকের ধন

চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

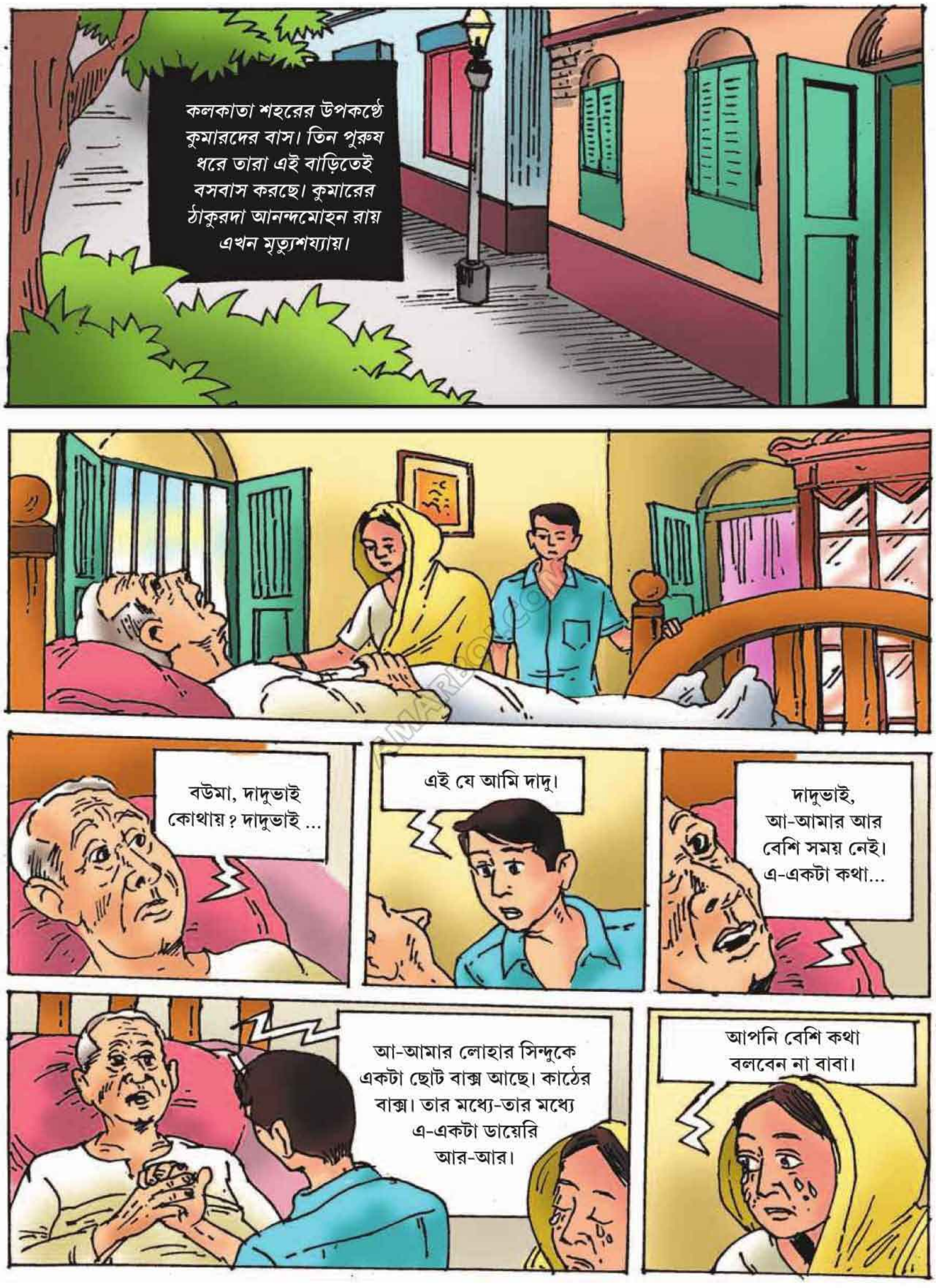

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

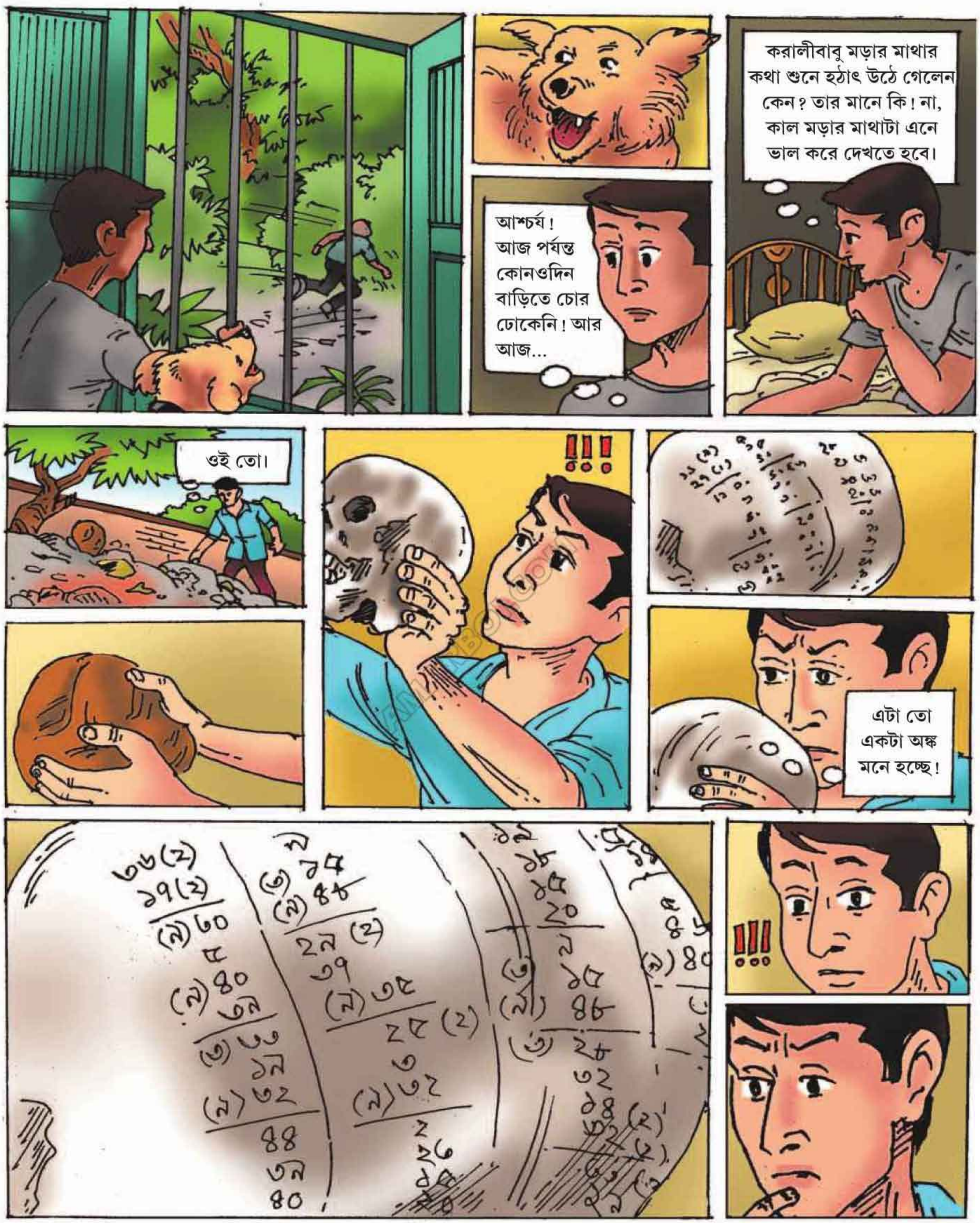

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬ (২)
১৭ (২)
(৯) ৩০
৫
(৯) ৪০
৩৯
(৩) ৩৩
১৯
(৯) ৩২
৪৪
৩৯
৪০
১৫ (২)
১৯
৩৭
৫
৪০
(৯) ৩০
৪২
(৯) ২৯
(৯) ১৩
৩৩
৫
৩৫
(৩) ৩০
(৯) ১৩
৩০
৪২
১৫
২০

৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮
২৯ (২)
৩৭
(৯) ৩৫
২৫ (২)
৩
(৯) ৩২
২
২৩
১৫
২০
৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮
৩৫
৫
৩০
৩১
(৯) ৩০
৩৫
৩৫ (২)
(৯) ৩৭

১৯
৪৮
১৫
২০
৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮
(৩) ২৮
৩২
১৪ (২)
৩২ (২)
৩৩ (২)
২৯
৩৯
২৮ (২)
৩৯
২৮
৪০ (২)
৪৮
৪৪ (২)
২৮
৪৫ (২)
২৮
২০
(৩) ৩৭

৫২
১৪
৫
৪৬
(৯) ৪০
৩৩
২৯
৩৩ (২)
(৯) ৩৫

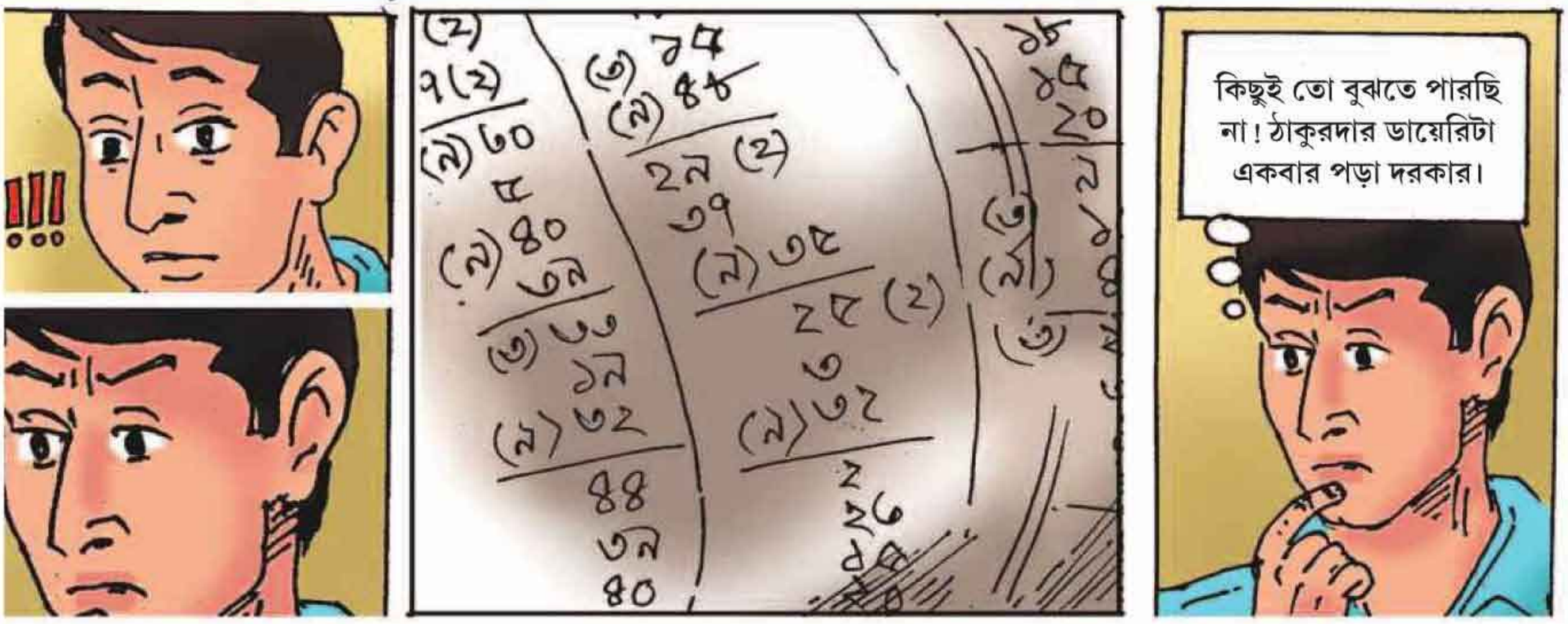

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

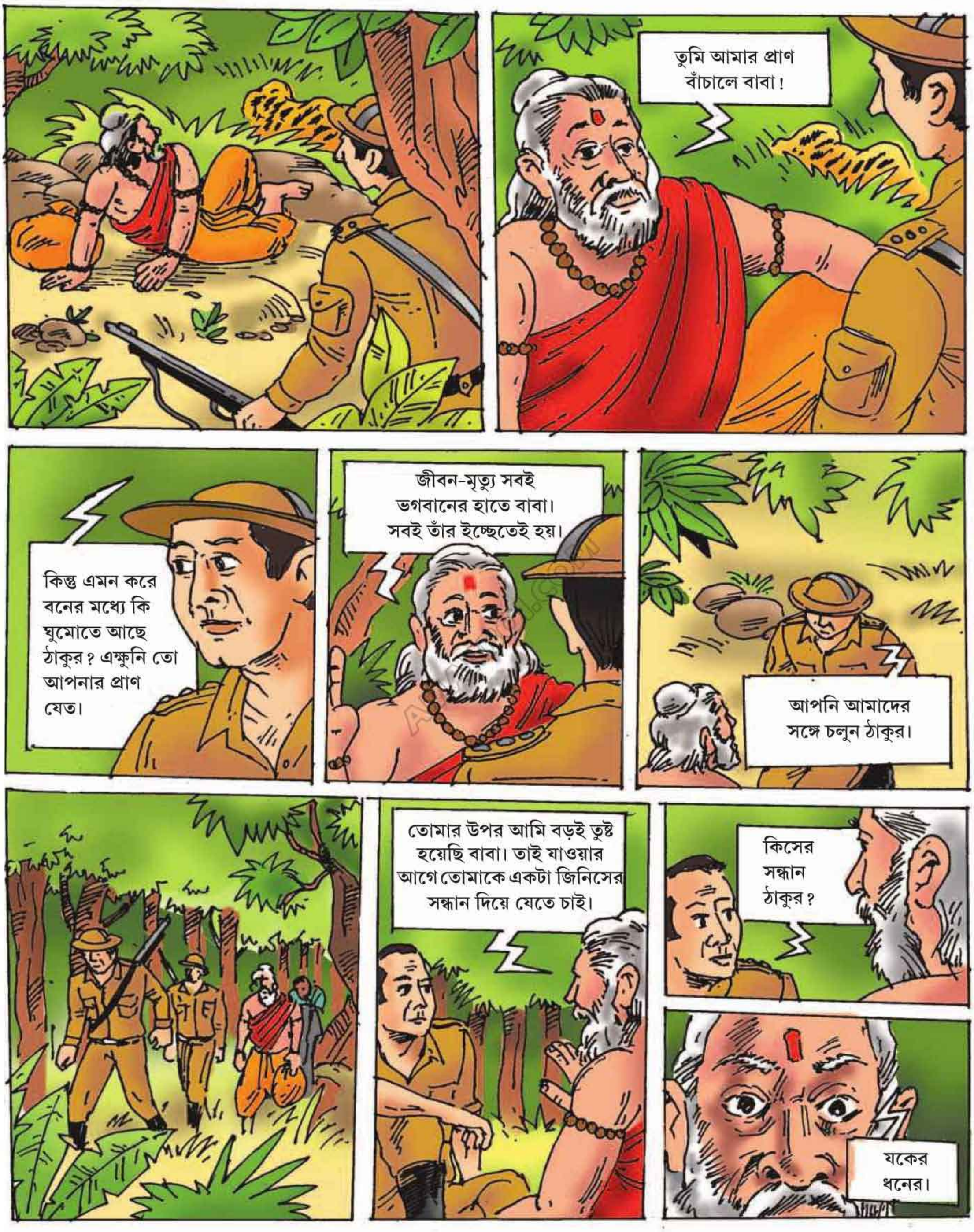

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(এর পর ৫ মে সংখ্যায়)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হোম ডেলিভারি

জমিদার সুদর্শন রায়চৌধুরীর বাড়িতে চুরি করা চাট্টিখানি কথা নয়। পঞ্চার মতো ছিঁচকে চোরের পক্ষে তো নয়ই। সব সময় জমিদার বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকরবাকর, লোকলস্কর এমনকী প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড পর্যন্ত। বাড়িভর্তি জমিদারের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। কারণ, দু'দিন আগেই তাঁর নাতনির বিয়ে হয়েছে। এত লোকজনের চোখে ধুলো দিয়ে কেমন করে জমিদার বাড়িতে চুরি করবে পঞ্চা? তাই সে ভাবল, রাতের অন্ধকার ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

সেদিন দুপুর থেকেই বউ উদ্‌ব্যস্ত করে মারছে পঞ্চাকে। কুয়ো থেকে জল তুলতে-তুলতে গজগজ করে সে বলল, "সারাদিন খাই-খাই আর ঘুম। কাজের নামে অষ্টরম্ভা। শুধু বড়-বড় কথা। এত অলস স্বামী কারও হয় না। আজ রাতে যদি কিছু চুরি করে আনতে না পার, তবে কাল থেকে খাওয়াদাওয়া বন্ধ। আমার গয়নাগাঁটি, বাটি-ঘটি আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চা একটু লোভী ও আয়েসি বটে, কিন্তু চুরি সে করতে পারে না, এমনটা নিন্দুকেও বলতে পারবে না। দীর্ঘদিন চুরি না করলেও বউয়ের অনর্গল তির্যক কথা তার সহ্যের বাইরে। তাই সে ঠিক করল, সেদিন রাতেই জমিদার বাড়িতে চুরি করবে এবং বউয়ের কটুক্তির জবাব দেবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। পুরনো সব যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে, সারা গায়ে জবজবে করে তেল মেখে, খাটো ধুতি কোমরে গুঁজে, ঠিক রাত বারোটায় জমিদার বাড়ির দিকে রওনা দিল পঞ্চা। বিশাল বাড়ি। তার চার-চারটে সদর দরজা। দরজাগুলো পেরিয়ে অনেকটা গিয়ে তবে মূল বাড়ি। পঞ্চা গেটে-গেটে ঘুরে বেড়াল। চারটে গেটেই গোঁফওয়ালা বিহারি দরোয়ান বন্দুক হাতে মার্চ করে বেড়াচ্ছে। তাদের কারও হাতে তেলমাখানো লাঠি। পঞ্চার শীর্ণ শরীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দুক দরকার হবে না। লাঠির ঘা একবার পড়লেই দফারফা। হাড়ের সংখ্যা দুশো ছয় থেকে দ্বিগুণ হয়ে চারশো বারোয় দাঁড়ালেও আশ্চর্যের কিছু নেই। তাই পঞ্চা মনে-মনে ভাবল, গেট দিয়ে জমিদার বাড়িতে ঢোকা অসম্ভব। তাকে অন্য কোনও উপায় দেখতে হবে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, জমিদার বাড়ির পশ্চিম দিকে আলোটা অপেক্ষাকৃত কম। আর দেরি না করে আবছা অন্ধকারে, একলাফে পাঁচিল টপকে গেল পঞ্চা। সামনেই পেয়ে গেল আউটহাউজের লোহার গেট, ঘোরানো সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে পড়ল বারান্দায়। সেখানে কেউ নেই, শুধু একটা তক্তপোশ পাতা। বারান্দা সংলগ্ন দুটো ঘর তালাবন্ধ।

পঞ্চা বের করল তার 'মাস্টার কি'। বিনা আওয়াজে ম্যাজিকের মতো তালা খুলে গেল তার চাবিতে। ঝোলা থেকে টর্চটা বের করে এদিক-ওদিক ঘরের মধ্যে আলো ফেলে সে দেখল, ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। এই ঘরদুটোয় আলমারি, সিন্দুক কিছুই নেই। দুটোই ভাঁড়ার ঘর। প্রথম ঘরটায় চার-পাঁচটা ফ্রিজ দণ্ডায়মান। বিশাল

তৃতীয় ফ্রিজ খুলেই তার চক্ষু ছানাবড়া। ক্ষীর আর রাবড়ির সমাবেশ। আর যে পঞ্চা অপেক্ষা করতে পারে না! আধহাঁড়ি ক্ষীর আর একহাঁড়ি রাবড়ি সাপটে তার অজগরের ছাগল গেলার অবস্থা। চুরি করা মাথায় উঠল পঞ্চার। রাত তো কম হল না। দুটো। ঘুমে শরীর একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। বারান্দায় রাখা তক্তোপোশে সটান শুয়ে পড়ল সে। সকালে চোখ মেলতেই সামনে সারি-সারি লাঠিধারী জমিদার বাড়ির লোক-লস্কর আর সাক্ষাৎ জমিদার সুদর্শন রায়চৌধুরী। চোখে-মুখে যেন আগুন জ্বলছে। হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "কে তুই? কী করতে এখানে এসেছিস?"

জমিদারের সাঙ্গোপাঙ্গরা তো পঞ্চাকে এই মারে তো সেই মারে। চোখ কচলে পঞ্চা তক্তপোশের উপর উঠে বসে হাত জোড় করে কাঁচুমাচু গলায় বলল, "আমাকে দয়া করে মারবেন না। আমি চোর। চুরি করতেই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু কিছু চুরি আমি করিনি। বিশ্বাস করুন, শুধু পেট ভরে দুটো খেয়েছি। আমাকে মাফ করবেন।"

কড়া গলায় জমিদার বললেন, "না বলে

পঞ্চা বের করল তার 'মাস্টার কি'। বিনা আওয়াজে ম্যাজিকের মতো তালা খুলে গেল তার চাবিতে।

টেবিলের উপর রাখা ছোট-বড় বিভিন্ন পাত্রে লোভনীয় সব খাবার। সবে নাতনির বিয়ে গিয়েছে তো, মনে হয় তারই উদ্বৃত্ত খাবারগুলোকে জ্বাল দিয়ে রাখা আছে। এই ভেবে পঞ্চা পোলাওয়ের গামলা থেকে একথাবা পোলাও তুলে নিয়ে টেস্ট করে দেখল। না, একদম পচেনি। ম ম করছে ঘিয়ের গন্ধ। টেবিলের উপর রাখা একটা বড় থালায় কিছুটা পোলাও ঝটপট তুলে নিয়ে পঞ্চা খুঁজতে লাগল মাংসের ডেকচিটা।

বেশ খানিকটা পোলাও আর মাংস সাবাড় করে ফ্রিজ খুলল পঞ্চা। থরে-থরে মিষ্টি সাজানো। চমচম, ল্যাংচা, রসগোল্লা। এ ছাড়া কত রকম মিষ্টি, তা কোনওদিন চোখেও দেখেনি সে। পাশের অন্য একটা ফ্রিজ খুলে দেখল, সারি-সারি দইয়ের হাঁড়ি। সাদা দই, লাল দই, আমদই, কত রকম দই।

খাওয়া আর চুরি করা সমান অপরাধ।"

জমিদারের লোকজন সব রে-রে করে উঠল। তারা চোরকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার দাবি তুলল। পঞ্চা তো ভয়ে কুপোকাত। তাকে নিয়ে জমিদারের লোকজন কী করবে কে জানে! সে কাকুতি-মিনতি করে জমিদারকে বলল, "আমি তো সত্যি কথাই বললাম। এর পর আপনি যে সাজা দেবেন দিন।"

হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে মিনমিন করে বলল, "দেখছেন আমার শরীর। হাড়গুলোই শুধু দেখা যায়। শরীরে বল পাই না। বেশি মার কিন্তু আমি সহ্য করতে পারব না, মরে যাব। আর আমি মরে গেলে জমিদারবাবু ভীষণ বিপদে পড়ে যাবেন।"

পঞ্চার কথায় জমিদারবাবু খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। তিনি তাঁর লোকলস্করদের চোরকে প্রহার করতে নিষেধ করলেন। তিনি পঞ্চাকে বললেন, "ঠিক আছে, তোকে আমি পুলিশেই হ্যান্ডওভার করব। পুলিশের ডান্ডা পিঠে পড়লে হয় তুই চুরি করা ছাড়বি, না হয় দেহত্যাগ। তাতে আমার নামে কোনও কেস হবে না। আর তোকেও উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে।"

এই কথা বলামাত্র সকলে চ্যাংদোলা করে পঞ্চাকে নিয়ে হাজির হল থানায়। ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরিহিত জমিদার পান চিবোতে-চিবোতে বললেন, "বড়বাবু একে থানার লক-আপে গ্যারেজ করে দিন।"

থানার বড়বাবু সবিনয়ে বললেন, "লক-আপে তো ঢোকাব, আসুন আগে বরং ডায়েরিটা নিয়ে নিই। হ্যাঁ, এবার বলুন তো, ও কী চুরি করেছে?"

মহাবিপদে পড়ে গেলেন জমিদার। আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা জমিদারের লোকজন চেঁচিয়ে উঠল, "ও সারারাত ধরে জমিদারের ভাঁড়ার ঘরে রাখা পোলাও, মাংস, মিষ্টি সব খেয়ে নিয়েছে।"

টেবিল থেকে মাথা তুলে বড়বাবু বললেন, "তার সঙ্গে চুরির সম্পর্ক কী? চুরি যাওয়া জিনিসটা কী, সেটা বলতে হবে। তবে তো আমি ডায়েরি নেব। সেই জিনিসটা উদ্ধার করে আপনাকে ফেরত দেব এবং চোরকে যথাযথ শাস্তি দেব।" বলে তিনি জমিদারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

জমিদার মনে-মনে ভাবলেন, সত্যিই তো কোনও জিনিস চুরি যায়নি। বেকায়দায় পড়ে জমিদার বড়বাবুকে বললেন, "কেন চুরি করে খেলে কি সেটা চুরি করা নয়?"

বড়বাবু তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "এভিডেন্স ছাড়া তো কোনও এফ আই আর হয় না। আপনি তো এফ আই আর করবেন কোনও জিনিস চুরি গিয়েছে বলে। অর্থাৎ কিনা, আপনি সেই জিনিস ফেরত পেতে চান। সঙ্গে চোরের শাস্তি।"

জমিদারের চক্ষু ছানাবড়া। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বড়বাবু ফিসফিস করে জমিদারকে বললেন, "আপনি বরং চোরকে ছেড়ে দিন। বিনা দোষে পুলিশে দিলে ও আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে দিতে পারে। তাতে আপনার বিপদ কিন্তু কম হবে না।"

উদ্বিগ্ন হয়ে জমিদার জিজ্ঞেস করলেন, "সে আবার কী?"

বড়বাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "মানহানির মামলায় চোর যদি সত্যিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিতে যায়, তা হলে অর্থদণ্ড তো হবেই, উলটে সর্বসমক্ষে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হতে পারে চোরের কাছে। সেটা নিশ্চয়ই আপনার মতো একজন দাপুটে জমিদারের পক্ষে খুব সম্মানের হবে না।"

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল পঞ্চা। মওকা পেয়ে শীর্ণ শরীরে সে জোর গলায় বলে উঠল, "বড়বাবু, আমি জমিদারবাবুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করব। মিথ্যে অপবাদে পুলিশে দেওয়ার প্রতিবাদ করব।"

চোরের জোরালো প্রতিবাদে থানা যেন কেঁপে উঠল। জমিদারসহ সমস্ত লোকজন ভয়ে আঁতকে উঠল। এখন কী উপায়! সত্যি যদি পঞ্চা মানহানির মামলা করে? সুদর্শনবাবুকে তো কোমর বেঁধে আদালতে তুলবে। কারও মুখে আর কথা সরে না। থানাজুড়ে পিনড্রপ সাইলেন্স। বড়বাবু চেয়ার থেকে উঠে হাতে রুলার নিয়ে কয়েকবার পায়চারি করতে-করতে জমিদারকে বললেন, "এখন একটাই উপায় হতে পারে। চোরকে আপনি নিঃশর্ত মুক্তি দিন। হাতির পা পাঁকে আটকে গিয়েছে।"

জমিদার অত্যুৎসাহে এগিয়ে এসে পঞ্চার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সহাস্যে বললেন, "বড়জোর দুটো খেয়েছিস। তাতে কী হয়েছে? আমি কিছু মনে করিনি। যা পঞ্চা বাড়ি যা। আর সকাল থেকে যা হয়েছে সব ভুলে যা।"

পঞ্চা ছাড়বার পাত্র নয়। সে শান্ত গলায় জমিদারকে বলল, "তা কী করে হয় জমিদারবাবু? চুরি করলে তো আপনি আমায় হাজতবাস করিয়ে ছাড়তেন। আমি চললাম উকিলবাবুর কাছে আপনার নামে মানহানির মামলা ঠুকতে।" বলে পঞ্চা থানার বাইরে বেরিয়ে যাবে বলে প্রস্তুত হল। সকলে রে রে করে উঠল। জমিদারবাবু করুণ গলায় বড়বাবুকে বললেন, "একটা কিছু উপায় বের করুন দারোগাবাবু।"

বড়বাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পঞ্চাকে এক ধমক লাগিয়ে বললেন, "দাঁড়া কোথায় যাচ্ছিস? আমার নির্দেশ ছাড়া থানা থেকে তুই কোথাও একপাও যেতে পারবি না। বল তোর কী চাই? মানে, মানহানির মামলার বদলে তুই কী চাস? টাকা চাই? জমিদারবাবু দিয়ে দেবেন।"

সুদর্শনবাবু হেসে ঘাড় নাড়লেন। বড়বাবু পঞ্চাকে অনুরোধ করে বললেন, "নে পঞ্চা, এই সামান্য কেসটা তোরা নিজেরাই মিটিয়ে নে। তাড়াতাড়ি কর। আমার অনেক কাজ আছে।"

পঞ্চার হঠাৎ ছেলে-বউয়ের কথা মনে পড়ে গেল। খেতে না-পাওয়া তাদের করুণ মুখদুটো পঞ্চার চোখের সামনে ভেসে উঠল। অনাহার আর অর্ধাহারে তার পরিবার বিপন্ন। সে তো শুধু পঞ্চারই জন্য। তার আলসেমির জন্য। পঞ্চা ভাবল, তার বউ, ছেলে তো কোনও দোষ করেনি। তাদের দায়িত্ব তো তারই। অকর্মণ্য পঞ্চার চোখ থেকে একফোঁটা জল বেরিয়ে এল। জমিদারবাবুর পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে পঞ্চা বলল, "আমাদের দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন জমিদারবাবু। ভীষণ গরিব আমরা। আমাদের বাঁচান।"

জমিদার পঞ্চার হাত ধরে উঠিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, "বেশ তাই হবে। জমিদার বাড়ি থেকে দু'বেলা তোর বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে।"

শুধু তাই নয়, জমিদার বাড়িতে যে-যে পদ রান্না হয়, সবই মস্ত টিফিনবক্সে ভরে রোজ দু'বেলা পৌঁছে যেতে লাগল পঞ্চার বাড়ি। পঞ্চার বউ ভীষণ খুশি। জমিদার বাড়ির লোভনীয় সব খাবার পেয়ে বেজায় আনন্দ পঞ্চার ছেলের। পঞ্চার চুরি করার আর প্রশ্নই নেই। পঞ্চার বউ তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দিতে-দিতে বলল, "এবার সত্যিই ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। হোম ডেলিভারি জিন্দাবাদ।

হয়তো এর পর থেকেই হোম ডেলিভারির যাত্রা শুরু।

ছবি: কুনাল বর্মণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় অয়ন্তিকাদিদি,

আমি ভালই আছি। তুমি কেমন আছ? তোমার ফোন নম্বরটা হারিয়ে ফেলেছি বলে যোগাযোগ করতে পারি না। কিন্তু 'খুদে প্রতিভা'য় তোমার নাম দেখে খুব আনন্দ হয়।

অয়ন ময়রা
অষ্টম শ্রেণি, কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

প্রিয় অহম,

ক্লাস ফাইভে ওঠার পর জানতে পারলাম, তুই স্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছিস। যেখানেই যাস, ভাল থাকিস। উত্তরের আশায় রইলাম।

অর্ক রায়
পঞ্চম শ্রেণি, পাঠভবন হাই স্কুল, কলকাতা।

প্রিয় পিয়াল,

পরীক্ষা তো শেষ। কী করবি ঠিক করেছিস? আমরা পুরী ঘুরে এলাম। খুব চিন্তা হচ্ছিল ফিরে এসেই খাতা দেখতে স্কুলে যেতে হবে বলে। মোটামুটি খারাপ হয়নি পরীক্ষা।

শরণ্যা কুণ্ডু
সপ্তম শ্রেণি, ক্যালকাটা গার্লস স্কুল, কলকাতা।

প্রিয় জুলি ও অলি,

তোরা কেমন আছিস? দাদু, দিদা ও মামিকে আমার প্রণাম জানাস। এবছর পরীক্ষার পর আমরা সবাই মিলে পুরী গিয়েছিলাম। সেখানে প্রচুর মজা করেছি। এবার তোদের বাড়ি গিয়েও তেমনই মজা করব। সবাই ভাল থাকিস।

পান্থবী বিশ্বাস
অষ্টম শ্রেণি, সুরভিস্থান ভুবনমোহিনী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়, নদিয়া।

প্রিয় সোহম,

তোর জন্মদিনে রইল অনেক শুভেচ্ছা। ভগবানের কাছে কামনা করি, তোর সব আশা পূর্ণ হোক। আর এই দিনটা তোর জীবনে বারবার ফিরে আসুক।

জুঁই দাস
দশম শ্রেণি, নব ব্যারাকপুর কলোনি গার্লস হাই স্কুল।

প্রিয় অবকাশ,

আমার সব স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। না পারছি পাখির মতো উড়তে, না পারছি ফুলের মতো ঝরে পড়তে। আমি ভাল নেই।

অনন্যা কর
দশম শ্রেণি, ছাতনা বাসুলী বালিকা বাণীপীঠ, বাঁকুড়া।

প্রিয় ঠাকুরমা,

তুমি কেমন আছ? শরীর এখন আগের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ নিশ্চয়ই? অনেকদিন তোমাদের ওখানে যাইনি। আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এবার যেতে পারব?

ঋক বাঙ্গাল
অষ্টম শ্রেণি, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজিয়েট স্কুল।

প্রিয় ভাই,

কেমন আছিস? অনেকদিন তোদের বাড়ি যাওয়া হয় না। তুইও আমাদের বাড়ি আসিস না। এবার একদিন সময় করে আমাদের বাড়ি চলে আয়। আমরা দু'জন মিলে খুব মজা করব। ভাল থাকিস।

শিঞ্জিনী মণ্ডল
সপ্তম শ্রেণি, শ্রীশিক্ষায়তন স্কুল, কলকাতা।

প্রিয় অরুণিমা,

কেমন আছিস তুই? ছুটিতে তোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না বলে খারাপ লাগছে। আরও খারাপ লাগছে যখন ভাবছি, গরমের ছুটি পড়বে আর তখনও তোর সঙ্গে দেখা হবে না। তোরও কি আমার জন্য মনখারাপ হবে?

বেদাত্রী কর্মকার
ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা।

প্রিয় পার্থিব,

তোর শরীর খারাপ শুনেছিলাম কাকিমার মুখে। এখন কেমন আছিস? আমার শরীরও ভাল নেই, সর্দি-কাশিতে খুব ভুগছি। গরমে সাবধানে থাকিস। জাক্তার দেখাস।

অর্ণব চোংদার
ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, বরাহনগর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাইনোসরের পায়ের ছাপ

একটা, দুটো নয়। প্রায় হাজারখানেক নানা বয়সের ডাইনোসরের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তে অ্যারিজ়োনা-উটা প্রদেশের বর্ডারে। শুধু পায়ের ছাপই নয়, ডাইনোসরের লম্বা লেজ যে মাটির উপর ঘষে গিয়েছে, সেই দাগও রয়েছে। ২০০৫ সালে ভূবিজ্ঞানী চ্যাং এই চিহ্নগুলো প্রথম দেখতে পান। তারপর নানা পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রায় ১৯ কোটি বছর আগে এই দাগ তৈরি হয়েছে। তখন আমেরিকার এই অঞ্চলটি ছিল রুক্ষ মরুভূমি। তাই বালির উপর তাদের পা এবং লেজের চলার ছাপ এত গভীর ভাবে পড়েছে। তারপর দীর্ঘদিন তা বালিয়াড়ির নীচে চাপা পড়ে ছিল। বালিয়াড়ি সরতেই সেই ছাপ বেরিয়ে পড়েছে। বালিপ্রধান এলাকা বলে, মরুভুমির বালিতে বসে যাওয়া ডাইনোসরের পায়ের ছাপ সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে শক্ত ছাঁচের মতো হয়ে গিয়েছে। আসলে গোটা এলাকা বেলেপাথরে পরিণত হয়েছে। তাই এত বছর পরেও সেই ছাপগুলো নষ্ট হয়নি। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বেলেপাথরের এই ছাপও নষ্ট হয়ে যাবে।

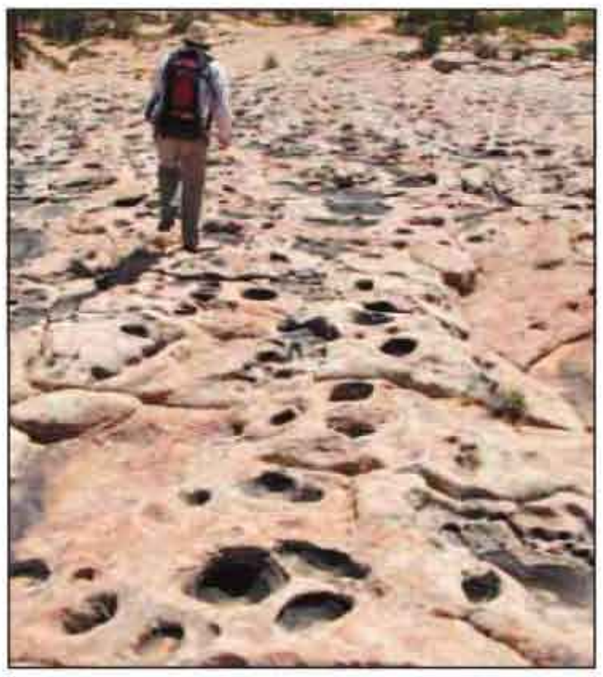

পোকার থেকে বাঁচার জন্যই জ়েব্রার ছোপ

জ়েব্রাদের গায়ে সাদা, কালো লম্বা-লম্বা দাগ নিয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তার শেষ নেই। কেন ওই রকম দাগ? তা ব্যাখ্যা করতে নানা তত্ত্ব সামনে এসেছে। কেউ বলেছেন, বাইরের তাপ থেকে শরীরকে আগলে রাখতে, কেউ বা বলেছেন হিংস্র প্রাণীদের চোখে ধুলো দিয়ে নিজেদেরকে বাঁচাতেই জ়েব্রাদের গা জুড়ে এমন দাগ। অনেকে বলেন, আসলে জ়েব্রাদের গায়ের লম্বা ছোপ দিয়েই তারা একে অন্যকে চিনতে পারে। তবে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং সুইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সংক্রান্ত দু'টি পৃথক গবেষণা নতুন এক ব্যাখ্যা পেশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, সমগোত্রীয় হলেও ঘোড়া এবং গাধার থেকে জ়েব্রাদের গায়ের লোম অনেক ছোট এবং হালকা। তাই জঙ্গলের মধ্যে বিষাক্ত, রক্তচোষা কীট-পতঙ্গ, মশা, মাছিদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই তাদের গায়ে এরকম সাদা-কালো ছোপ। আর তা তৈরি হয়েছে কেবলই প্রাকৃতিক বিবর্তনের নিয়মে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, জ়েব্রাদের গায়ের মতো বিশেষ মাপের সাদা-কালো ছোপের উপরে এই সব বিষাক্ত পোকারা বসতে চায় না। সমীক্ষায় আরও দেখা গিয়েছে, যেসব জঙ্গলে এই রকম বিষাক্ত পোকামাকড় বেশি রয়েছে, সেসব জায়গায় জ়েব্রাদের গায়ের ছোপ আরও বেশি উজ্জ্বল। বিষাক্ত, রক্তচোষা কীটদের কামড় থেকে রক্ষা করতে প্রকৃতি জ়েব্রাদের এই বিশেষ রূপে সাজিয়ে দিয়েছে।

চাঁদের বয়স কমল

৪৫৩ কোটি নয়, ৪৪৭ কোটি বছর আগে জন্ম হয়েছিল চাঁদের। আর তা হয়েছিল, সৌরজগৎ তৈরি হওয়ার সাড়ে ন' কোটি বছর পর। সাম্প্রতিক এক গবেষণায়, এমনটাই দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। এর আগে মনে করা হত, সৌরজগৎ তৈরি হওয়ার তিন থেকে চার কোটি বছর বা তার কিছু পর চাঁদের জন্ম হয়। থিয়া বা ওরফিউস নামে প্রায় মঙ্গলের সমান এক মহাজাগতিক খণ্ডের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হওয়ার কারণেই চাঁদের সৃষ্টি

হয়েছে। এই ধারণাটি বৈজ্ঞানিক ভাবে গৃহীত হলেও, সংঘর্ষের সঠিক সময়টা ঠিক কখন, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজও গবেষণা চালাচ্ছেন। সেখানে এই নতুন সময়ের হিসেব ৯৯.৯ শতাংশ সঠিক বলে দাবি করা হয়েছে।

নতুন বামন গ্রহ

সৌরমণ্ডলের শেষ সীমায় আবার নতুন এক বামন গ্রহের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য, প্রথম দেখা মিলেছিল ২০১২ সালে। তারপর বিস্তর অনুসন্ধান চালিয়ে, গত মার্চ মাসে নতুন এই গ্রহকে স্বীকৃতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ সংস্থা। গ্রহটির নাম আপাতত, ২০১২ ভি পি ১১৩। গোলাপি রঙের এই গ্রহ, সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় প্রায় চার হাজার বছর। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, নতুন এই গ্রহ পৃথিবী থেকে কত দূরে। বিজ্ঞানীরা আমাদের সৌরমণ্ডলকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে এই স্তর ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে পাথুরে গ্রহের স্তর। তার পরে রয়েছে গ্যাসীয় স্তর। এর পর কুইপার বেল্ট, যা নেপচুনেরও পরে এবং সব চেয়ে দূরে এবং শেষে ওর্ট ক্লাউড। যেখানে সব কিছুই বরফের মতো জমে রয়েছে। ২০১২ ভি পি ১১৩ এই ওর্ট ক্লাউডেরই বাসিন্দা। এর আগে সেডনা আর হুয়া নামে আরও দু'টি ছোট গ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল এই অঞ্চলে। তবে এগুলোকে আদৌ গ্রহ বলা যায় কিনা, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যেও দ্বিমত রয়েছে।

জয়দীপ চক্রবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(এর পর ৫ মে সংখ্যায়)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসন্তী গঙ্গোপাধ্যায়

অভিযান চিত্রকূট

রান্টু-সান্টু

এবার ছুটিতে অবনীশবাবু ঠিক করলেন সপরিবারে খাজুরাহো বেড়াতে যাবেন। কারণ, অনেকদিন থেকেই পৃথিবীবিখ্যাত এই ভাস্কর্য দেখার জন্য তাঁর স্ত্রী ইভাদেবী উদ্বেল হয়ে আছেন। তিনি তাঁর দুই যমজ ছেলে রান্টু আর সান্টুকে ডেকে বললেন, "কীরে, জায়গাটার তো ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে, যাবি তো তোরা?"

"হ্যাঁ বাবা, আমরা তো ইতিহাসে পড়েছি। তাই না রে রান্টু?" উদগ্রীব হয়ে রান্টুকে প্রশ্ন করে সান্টু।

"হ্যাঁ, ওটা তো মধ্যপ্রদেশে, তাই না?"

"একদম ঠিক বলেছিস রান্টু!" খুশি হয়ে ছেলের পিঠ চাপড়ে বলে ওঠেন অবনীশ।

"তা হলে তো পরশুর মধ্যে সব কিছু গোছগাছ করে নিতে হয়, কী বল?" প্রশ্ন করেন ইভাদেবী।

"তা তো হবেই! তোরাও নিজেদের সব কিছু ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিবি মায়ের সঙ্গে।"

"তুমিও যেমন! ওরা আবার কবে নিজেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনিসপত্র ঠিকঠাক গুছিয়ে নিতে পেরেছে, শুনি? ওজন্য ভেবো না, আমি সব ঠিক করে নেব'খন।"

"বড় হচ্ছে তো। ওদের একটু স্বনির্ভর হতে শেখাও। আর কতদিনই বা তোমার আঁচলের তলায় থাকবে ওরা?" বলেন অবনীশ।

"কী মজা! আমরা খাজুরাহো যাচ্ছি। এতদিন শুধু নামই শুনে এসেছি। সেই প্রসিদ্ধ জায়গাটায় আমরা কি না সত্যি-সত্যি যাচ্ছি! বন্ধুদের কাছে বেশ দাম বেড়ে যাবে, কী বল? ফিরে এসে যখন গল্প করব। হাঁ হয়ে যাবে সব। তাই না?" সান্টু রান্টুকে বলে।

রান্টু আর সান্টু দুই ভাই। দেখতে একই রকম, কিন্তু একটু তফাত আছে। রান্টুর চুলগুলো বেশ সাঁট করে আঁচড়ানো যায়। কিন্তু সান্টুর চুলগুলো একেবারে সরলবর্গীয় বৃক্ষশ্রেণী। কিছুতেই ওদের আঁচড়িয়ে বাগে আনা যায় না। যেমন বাগে আনা যায় না সান্টুকে। সে সবসময় যে-কোনও ব্যাপারে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর সেজন্য এমন কিছু কাজ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে, যাতে ভোগান্তি হয় সকলের। কোনও ব্যাপারে কোনও কৌতূহল সৃষ্টি হলে, সে তার শেষ না দেখে ছাড়বার পাত্র নয়। তাতে পৃথিবী যদি রসাতলে যায়, তাতে তার কিছুই যায় আসে না। আবার কোনও ব্যাপার তার পছন্দ না হলে প্রচণ্ড রেগে যায় সান্টু। তখন দিশেহারার মতো কী যে করে বসবে, কেউ জানে না। সোজা কথায়, কোনও কাজ করতে গিয়ে তার ফল কী হতে পারে, তা ভাবেই না সান্টু। কোনও ব্যাপারে তার কৌতূহল হলেই সে সেটা মেটাতে ঝাঁপিয়ে পড়বেই।

রান্টু সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। সে তার প্রতিটি পদক্ষেপ খুব চিন্তা করেই ফেলতে পছন্দ করে। তবে সান্টুকে বিপদ থেকে বাঁচাতে গিয়ে অনেক সময় নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই কিছু-কিছু কাজ তাকেও করে বসতে হয়। তবে কখনওই সে মা-বাবাকে কষ্ট দিতে এমনকী, চিন্তায় ফেলতেও চায় না।

॥ ২ ॥

খাজুরাহোয় রান্টু-সান্টু

রান্টু-সান্টুদের প্রাইভেট কার যখন কানহা জাতীয় উদ্যান পেরিয়ে খাজুরাহো এসে পৌঁছল, তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের মুখটা ভার হয়ে আছে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল প্রত্যেকের। ছেলেদের মুড অফ দেখে ইভাদেবী বললেন, "কাল দেখবি, রোদ উঠবে। দেখবি, সমস্ত কারুকার্য ভিডিও করে নিতে পারব আমরা।"

ওরা যখন কানহা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে দিয়ে আসছিল, তখন তো রীতিমতো ভয় করছিল ওদের। বাঁদিকের জঙ্গলের সামনে নেট দেওয়া। নেটের ওপাশে পাথর পরপর গেঁথে পাঁচিল মতো করা হয়েছে। কারণ, ভিতরে বাঘ আছে। ডানদিকের জঙ্গলটা কিছুটা খাদের মধ্যে, তাই আক্রান্ত হওয়ার ভয় নেই সহজে। রান্টু ভয়ে কাঁপছিল। আর সান্টু? সে তো বাঘ দেখার জন্য উদগ্রীব মুখ বাড়িয়েই ছিল অভয়ারণ্যের দিকে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও একটা ময়ূরী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি ওদের।

সামনেই একটা হোটেল পাওয়া গেল। হোটেল নারায়ণ প্যালেস। দোতলার একেবারে কর্নারের ঘরটা নিল ওরা। ছিমছাম বিরাট ঘর। আসলে এ সি রুম। কিন্তু এ সি-টা খারাপ হয়েছে, তাই একটু কমে পাওয়া গেল। বাইরের দিকে বিশাল কাচে নীল পরদা দেওয়া। বেডশিটও নীল। বাইরের হাওয়া পেতে হলে দরজা খোলা রাখতে হবে। বারান্দায় দাঁড়ালে দূরে কয়েকটা হলদেটে রঙের মন্দিরচূড়া দেখা যাচ্ছে। তাদের কারুকার্যও বোঝা যাচ্ছে কিছুটা।

পরদিন সকাল-সকাল ফ্রেশ হয়ে চা, ব্রেকফাস্ট ও স্নান সেরে বেরিয়ে পড়ল ওরা খাজুরাহোর পশ্চিমি গোষ্ঠীর মন্দিরগুলো দেখতে। দিনটা দারুণ। ঝকঝকে রোদ্দুর উঠেছে। ওরা মহানন্দে মন্দির দেখছিল। দেখছিল তার বাইরের স্তরের নানা কারুকার্য। পাথর কেটে এমন বানানো সম্ভব! অবাক হয়ে ভাবছিল ওরা। কী সুন্দর পেলব গা-হাত-পা! হাত দিলে জীবন্ত মনে হয়! আর পাথর কেটে তৈরি অত সুন্দর পোশাক আর গয়নাগুলো! একটা সিলিং দেখল ওরা পাথর কেটে বানানো অথচ এত পাতলা যে, দেখে মনে হচ্ছে কাগজ কেটে বানানো সামিয়ানার মতো! তাতে প্রতিভাত নানা শিল্পনৈপুণ্য।

'কেন' নদী থেকে পাথর বয়ে এনে বানানো হয়েছে মন্দিরগুলো। মানুষগুলো পিঠে করে পাথর বয়ে আনছে, এমন মূর্তিও বানানো রয়েছে মন্দিরের সিলিংয়ে। মন্দিরের মেঝেতে পাথরের শঙ্খ ও আলপনা তৈরি করা হয়েছে। ভিতরে একপাশে কালো রঙের চতুর্ভুজের মূর্তিটা তো দারুণ! বাইরে হরগৌরী, লক্ষ্মী-নারায়ণ, দেবী সরস্বতী (নৃত্যছন্দে) কী নেই? সকলকেই কেমন যেন নৃত্যবিভঙ্গে দেখানো হয়েছে।

একটা ব্যাপারে রান্টু-সান্টুর খুবই দুঃখ লাগছিল, এত সুন্দর সব মূর্তি অথচ কারও মাথা নেই, কারওর হাত বা পা নেই।

"সান্টু, এদিকে আয়। দ্যাখ-দ্যাখ, গণেশ নাচছে!"

"ওমা! তাই তো!" সান্টুর কথা কেড়ে নিয়ে বলেন অবনীশ, "পুরাণের গল্পে আছে সতীর মৃত্যুতে শিব প্রলয়নাচ নেচেছিলেন। তিনি আবার নটরাজ ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নট।"

অনেক সিঁড়ি ভেঙে কান্ডারীয় মহাদেবের মন্দির চাতালে উঠে মুন্ডুহীন এক নারীমূর্তির গায়ে হাত দিয়ে অবাক হয়ে যান ইভাদেবী। বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বলে ওঠেন, "এর গা এতই কমনীয়, যেন জীবন্ত মানুষের চেয়েও জীবন্ত। এ কি সত্যিই পাথরের? এর স্পর্শে সারা শরীরে যেন শিহরণ খেলে যাচ্ছে।" মন্দিরের প্রাকারে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তির অবস্থান। একেবারে গর্ভগৃহে অবস্থিত শিবলিঙ্গটি বেশ বড়।

দেখাশোনার পর দুই ভাই "খিদে-খিদে!" করতেই একটা হোটেলে পৌঁছল ওরা। দাদা-বউদির হোটেল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, মেদিনীপুর থেকে আসা এক ভদ্রলোক হোটেলের মালিক। হোটেলের মেনু চার্টও কিনা বাংলায় লেখা! পদগুলোও বাঙালি পদ। কতদিন পর একেবারে সেদ্ধ চালের ভাত, শুক্তোনি, মোচার কোপ্তা, মুসুরির ডাল দিয়ে একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেল যেন।

॥ ৩ ॥

এম্পোরিয়ামে গন্ডগোল

মন্দির থেকে লজে ফেরার পথে অবনীশবাবু বললেন, "এম্পোরিয়ামটা একটু ঘুরে দেখে যাই। কালই তো বেরিয়ে যাব।"

"হুঁ, তা তো ঠিকই। তবে এখানে দাম খুব বেশি সবকিছুর। যদি নিতেই হয় তবে এমন একটা মূর্তি নাও, যেটা দেখে মনে হবে একেবারে খাজুরাহোর মন্দিরের দেওয়াল থেকে তুলে আনা হয়েছে," বললেন ইভাদেবী।

কিন্তু এম্পোরিয়ামে খাজুরাহোর মূর্তির মতো ওই রকম বেলেপাথরের কোনও মূর্তি পাওয়া গেল না। শেষে দেখে-শুনে শ্বেতপাথরের অনুপম একটা অপ্সরামূর্তি পছন্দ করলেন অবনীশবাবু আর ইভাদেবী। অপ্সরাটি লীলায়িত ভঙ্গিতে বাঁহাতে ডান পায়ের পাতা তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে তা থেকে কাঁটা তুলছে।

ওরা যখন কানহা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে দিয়ে আসছিল, তখন তো রীতিমতো ভয় করছিল ওদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওটা নিও না," চিৎকার করে ওঠে সান্টু, "ওটা ভাল না।"

"তবে কী নেব?"

"ডান্সিং গণেশ! ডান্সিং গণেশ নাও," রান্টুও বলে ওঠে।

"আরে বাবা, বাড়িতে তো বিষ্ণুপুরের মিউজিশিয়ান গনেশ রয়েছে একটা। কত সুন্দর," বললেন অবনীশবাবু।

"আচ্ছা ঠিক আছে চলো দেখি খাজুরাহো ঢঙের গণেশ মূর্তি মেলে কিনা, ওরা যখন বলছে", বললেন ইভাদেবী।

কিন্তু ডান্সিং গণেশ যদি বা মিলল, তা লালচে পাথর কুঁদে বানানো আর একেবারেই খাজুরাহো ঢঙের নয়। তাই ডান্সিং গণেশ নেওয়া গেল না। আর হাঁড়ির মতো মুখ দুটো বাবা-মা'র সঙ্গে ফিরল হোটেলে। কারও মুখে আর রা নেই একটুও।

রাত আটটা নাগাদ কফির অর্ডার দিলেন অবনীশবাবু। কফি আসতে আনন্দই হয়েছে, কিন্তু তা মুখে প্রকাশিতব্য নয় রান্টু-সান্টুর। ভাব এমনই যেন ওসব তুচ্ছ ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই তাদের।

"কীরে? আর দুটো কফি, আর দু'প্লেট টোস্টের কী হবে? ফেরত দিয়ে দেব? দিয়ে দিক ওরা অন্য কাউকে।"

"না-না!" বলে চিৎকার করে ছুটে আসে দু'জন। তারপর মনের আনন্দে সদ্ব্যবহার করতে থাকে ওগুলোর।

॥ ৪ ॥

এবার যাত্রা চিত্রকূটে

খাজুরাহো থেকে পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে, স্নান করে গাড়িতে গিয়ে উঠল রান্টু আর সান্টু। ব্যগ্র কণ্ঠে সান্টু প্রশ্ন করল, "বাবা এবার আমরা কোথায় যাব?"

"আবার কোথায় যাবে? সোজা বাড়ি।"

"যাওয়ার সময় পথে তো চিত্রকূট পড়বে, ওদের একটু দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক," বললেন ইভাদেবী। ড্রাইভারকে তেমনই নির্দেশ দিলেন অবনীশ। গাড়ি চলল চিত্রকূটের উদ্দেশে।

"বাবা আমরা কি সেই রামায়ণের চিত্রকূটের উদ্দেশে চলেছি?" প্রশ্ন করে রান্টু।

"হ্যাঁ বাবা!" চলন্ত গাড়ি থেকে উত্তর দেন অবনীশ।

"রবিঠাকুরের সেই কবিতাটা মনে কর না তোরা। সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবি," বললেন ইভাদেবী।

"হ্যাঁ তো। সেই যে,

'বাবা যদি রামের মতো পাঠায় আমায় বনে...

চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই এমনই বরষাতে।

লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার থাকতো সাথে-সাথে'"

সান্টুর মুখ থেকে ছড়াটা কেড়ে নিয়ে শেষ করে রান্টু।

"আমরা সেই পাহাড়েই যাব। কী মজা!" গাড়ির ভিতরেই যেন লাফিয়ে উঠতে চায় সান্টু।

পথের দু'পাশ ক্রমশ যেন আরও সবুজ হয়ে আসছে। দু'পাশে মাঠও আছে। ঘাসও আছে। কিছুটা যাতেই গাছপালার মধ্য দিয়ে কয়েকটা সবুজ ঘাসে ভরা টিলা চোখে পড়ল। ওর মধ্যে একটা পাহাড়ের মাথায়, গায়ে গর্ত খোঁড়া হয়েছে বলে মনে হল। গর্ত করায় লাল শক্ত মাটি বেরিয়ে পড়েছে।

"চিত্রকূট দেখা যাচ্ছে। ওই দ্যাখো চিত্রকূট," বললেন অবনীশ।

"কিন্তু ওর মধ্যে কোনটা বাবা?" সান্টুর অধৈর্য প্রশ্ন, "আর পাহাড়গুলো খোঁড়া রয়েছে কেন?"

"কাছে গিয়ে সব জানা যাবে। এবারে একটু স্থির হ তো," ছেলেদের বললেন অবনীশ।

"কূট মানে তো পাহাড়, তাই না মা?"

"হ্যাঁ।"

ওদের গাড়ি ক্রমে সংকীর্ণ পথে যেতে লাগল। ওরা একটা লোকালয়ে প্রবেশ করল। সেখানে স্কুলড্রেস পরে বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরছে। এদিকে কোথাও হয়তো বাড়ি হবে।

হঠাৎ একজন গাইড পাওয়া গেল। তিনি ওদের প্রথমে মন্দাকিনী নদীতে নিয়ে গেলেন। স্বর্গের মন্দাকিনী এখানে? কী সুন্দর নদী! ওদের খুব ভাল লাগল। কী সুন্দর বাঁধানো ঘাট। অনেক সিঁড়ি বেয়ে নেমে আচমন করতে হল। গাইড বললেন, এটা লক্ষ্মণঘাট। ওদিকে রামঘাট আছে।

"সান্টু রে, আমরা স্বর্গে পৌঁছে গিয়েছি নির্ঘাত। মন্দাকিনী তো স্বর্গের নদী।"

"বুঝলি না, রাম-সীতা এখানে ছিলেন। তাঁরা তো ভগবান। স্নান করবেন কি যেখানে-সেখানে? তাই মন্দাকিনীকে এখানে আসতে হল!"

"তুমি ঠিক বলেছ খোকা। রামকে যখন তাঁর বাবা চোদ্দো বছরের জন্য বনবাসে পাঠালেন, তখন তিনি বিষ্ণুর পূজা করলেন। তারপর বিষ্ণুকে বললেন, 'ভগবান এত বছর বনবাসে আমি কোথায় থাকব?' বিষ্ণু বললেন, 'তুমি চিত্রকূটে চলে যাও।' রাম খুঁজতে-খুঁজতে এই পাহাড়ের কাছে এলেন। তিনি জানেন কূট মানে পর্বত আর এই পাহাড়ের গায়ে ধনুর্বাণের চিহ্ন আঁকা রয়েছে। তা হলে এটাই হবে চিত্রকূট। রাম তখন মন্দাকিনীতে স্নান করে চিত্রকূটের মধ্যস্থ বিষ্ণুকে মুখ খুলতে বললেন। চিত্রকূটের মুখ ফাঁক হয়ে গেল। রাম তাঁর ভিতর থেকে পাঁচটার মধ্যে দুটো শালগ্রাম শিলা বের করে এনে তার পুজা করলেন। ওই মুখ এখনও আছে। কখনও তা দিয়ে দুধ পড়ে, কখনও জল।"

চিত্রকূটের সেই মুখ দর্শনের জন্য জুতো খুলিয়ে একটা ছোট্ট মন্দিরের সামনে নিয়ে গেলেন গাইড। মন্দিরের ভিতরে প্রচুর ফুল, বেলপাতায় ভরা একটা বড় কালো মুখ দেখা গেল। যার কপালে রুপোর তিলক কাটা। এ পাশে একই রকম একটা ছোট মুখ।

মুখ থেকে ফুল-বেলপাতা সরিয়ে বের করে পুরোহিত মশাই বড় মুখটার বিরাট হাঁ থেকে দু'টি শালগ্রাম শিলা বের করে দেখালেন। এর পর ওখানে ওই দেবতার জন্য দুধ দানের কথা বলা হল। দুধের জন্য একশো টাকা ধরে দিলেন অবনীশবাবু। মন্দিরসংলগ্ন বারান্দায় ওদের নিয়ে এসে গাইড এবং পুরুতমশাই পাঁচটি গর্তকে প্রদক্ষিণ করালেন। তারপর বললেন, "এর কোনও একটাকে আপনাকে শস্যপূর্ণ করতে হবে।"

"ওই তো চিত্রকূটকে দুধ দিলাম আর কিছু দেওয়া যাবে না।"

"বুঝলেন, কেউ যদি সাতদিন নিরামিষ খেয়ে থাকে, তবে সে রাত বারোটায় ওই চিত্রকূট বা কামোদ পাহাড়ের মাথায় শঙ্খঘণ্টার শব্দ শুনতে পাবে।"

"সত্যি বলছেন?" প্রশ্ন করেন ইভা।

"আচ্ছা হনুমান ধারাটা কোথায়?" প্রশ্ন করে অবনীশ।

"আজ তো বেলা হয়ে গিয়েছে। ও তো দূর আছে। এদিকে আসুন। এই ভরতজি কি মন্দির। ওই জলচৌকিতে রামের পাদুকা রয়েছে।"

"সত্যি রামের খড়ম? সেই ক-ত বছরের পুরনো?" চোখ বড়-বড় করে বলে সান্টু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"খড়ম মাথায় ঠেকাও। ভরত এই খড়ম নন্দীগ্রামে নিয়ে গিয়ে রাজত্ব চালিয়েছিলেন। সিংহাসনে বসেননি। ভরতজি কো কুছ দিজিয়ে।"

"আমরা হনুমানধারা যাব," চেঁচিয়ে ওঠে রান্টু আর সান্টু।

"আপনি বারণ করছেন কেন শাস্ত্রীজি? বাচ্চারা একটু দেখতে চায়। আমাদের তো গাড়ি আছে," বলেন অবনীশ।

"ঠিক আছে চলুন। তবে জানকীকুন্ড, অনসূয়া মন্দির, সীতাজি কি পায়ের ছাপ, পর্ণকুটির কুছ আজ হবে না। আজ আপনারা থেকে যান।"

"ঠিক আছে চলুন তো। বেলা পড়ে এসেছে।"

ওরা গাড়ি থেকে নামল একটা স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশে। সামনেই একটা বেদিওয়ালা অশ্বত্থ গাছ। সেটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে তিনটি পর্বতকে দূর থেকে দেখানো হল ওদের। বাঁপাশের ছোটটি লক্ষণ পর্বত। মধ্যেরটি কামোদ/ চিত্রকূট পর্বত। একদম ডাইনে বড় দেখতে সংকর্ষণ পর্বত। ওর মধ্যে গাছপালার ফাঁক দিয়ে সাদা-সাদা বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। রাম হনুমানকে এটি দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু লঙ্কা পোড়াবার পর হনুমানের গায়ের জ্বালা সারছিল না। তখন রাম ওই পর্বতে বাণ নিক্ষেপ করে জল বের করেন। ওই জলধারাই হল হনুমানধারা। ওই মন্দিরে যে হনুমান মূর্তি আছে, তাঁর বাহুর উপর ওই জলধারা একভাবে ঝরে চলেছে। কোথা থেকে আসছে কেউ তা জানে না।

রাম আর সীতা ওই কামোদ পর্বতের (চিত্রকূট) পিছনে দুটো বড়-বড় পাথরের উপরে শুতেন। লক্ষণ পাহাড় থেকে আর সংকর্ষণ পাহাড় থেকে হনুমান তাদের পাহারা দিতেন। তা ছাড়া এখানে মুনি-ঋষিরা পূজার্চনা করতেন। রাক্ষসরা এসে তাঁদের বিরক্ত করত। রাম, লক্ষণ, হনুমান তীর-ধনুক নিয়ে তাদের তাড়া করতেন।

"ওই রকম পাথরে কি শুয়ে থাকা যায়? শীত পড়লে বা বৃষ্টি হলে?" প্রশ্ন করে রান্টু।

"ওখানে কি আমরা শুতে পারি? কিন্তু রামজি শুধু পারেন। এখনও আছেন উনি কামোদ পাহাড়ে। রোজ শুচ্ছেন। আমরা দেখতে পাই না।"

"কেন? আমরা দেখবো। কখন কত রাতে রামজি শোবেন বলুন না। নিরামিষ খেয়ে থাকলে হবে না?"

"হবে। ভক্তিও চাই। বিশ্বাসও চাই। এই মন্দাকিনীর ঘাটে বসে তুলসীদাস রামায়ণ লিখতেন। চন্দন ঘষে রাখতেন। রাম এলে পরে চলে যেতেন। অত বড় ভক্ত তাঁর দেখা কখনও পাননি।"

"রাম সশরীরে সাড়ে এগারো বছর এই চিত্রকূটে ছিলেন। তিনি যখন চলে যাচ্ছেন চিত্রকূট কান্নাকাটি করায় তিনি তাকে বললেন, 'আজ থেকে তোমার কাছে যে যা কামনা করবে তাই পাবে।' তাই এর আর-এক নাম কামোদ পর্বত। তারপর বললেন, 'আমি কি তোমায় ছেড়ে যেতে পারি? আমি এখানেই থাকব।' আজও রাম ভগবানজি আসেন। মন্দাকিনীতে স্নানভি করেন। চিত্রকূটের পুজো করেন। তার পিছনের শিলায় রাতে শুয়ে পড়েন।"

কিন্তু লঙ্কা পোড়াবার পর হনুমানের গায়ের জ্বালা সারছিল না। তখন রাম ওই পর্বতে বাণ নিক্ষেপ করে জল বের করেন।

"চিত্রকূটের পিছনে যাওয়া যাবে না?" বলে রান্টু।

"কেন তুমি যেতে চাও? ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। কী করবে গিয়ে?"

"সেই শিলা আর রামচন্দ্রকে দেখব," বলে সান্টু।

"ওখানে যেতে মানা আছে। পাহাড়ের পিছন বহু দূর।"

"তা হোক... " বলে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সান্টু। ওকে থামিয়ে দিয়ে ইভাদেবী বলেন, "আঃ! বায়না করে না বাবা। উনি যা বলছেন শোনো।"

"একঠো দিন থেকে যান না। গুপ্ত গোদাবরী এই বিকেলে যাওয়া যাবে না বাবু। ওটা জঙ্গলের মধ্যে।"

"ঠিক আছে। থেকে যাই, কী বলো?"

"যা তোমার ইচ্ছা।"

"কীরে, থাকতে চাস নাকি তোরা এখানে রাতটা?"

"হ্যাঁ," সজোরে চেঁচিয়ে ওঠে দু'জন।

"আপনার কোনও চেনা থাকবার জায়গা আছে?"

"আছে বাবু। বাড়ি। এখানে লজ পাবেন না।"

"ঠিক আছে চলুন। দেখি আপনার রামচন্দ্র কী লিখেছেন আমাদের ভাগ্যে।"

॥ ৫ ॥

সান্টু কোথায়?

গাইড বংশীওয়ালের পিছন-পিছন একটা লোহার গেট দিয়ে অতি সাধারণ একটি কোঠাবাড়িতে ঢুকল ওরা। বারান্দার উপর টিনের চাল। কিন্তু ঘরগুলোয় কংক্রিটের ছাদ আছে। প্রত্যেকের ঘরে তক্তপোশ আছে একটা করে। ভিতরে বিরাট উঠোন। সেখানে কুয়োতলা, উঠোনের শেষে একটা বড় টিনের দরজাকে বন্ধ করে একটা ইট দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। ওই দরজার বাইরে কোনও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই। সেই অন্ধকারেই টয়লেট।

গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। উনি আশ্রমে গায়ত্রী দেবীর পূজারী ছিলেন। এখনও ঘরের কুলুঙ্গিতে গায়ত্রী দেবী আছেন। তাঁকে পুজোও করা হয়। পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে ঘরভাড়ার কথাবার্তা সেরে মুখোমুখি দু'টি ঘরে মালপত্র রেখে ওরা চলল মন্দাকিনীর ধারে।

সেখানে যেন উৎসব চলছে। অতি সাধারণ বস্ত্রপরিহিতা কয়েকজন মহিলা মন্দাকিনীতে প্রদীপ ভাসিয়ে অপূর্ব ভজন গাইছেন। ভাষা অজানা, কিন্তু সুরে গাইছেন বোঝা যায়। ইভাদেবী মুগ্ধতা প্রকাশ করেই বললেন, "চমৎকার! এঁরা এমন সুরে গাইছেন কী করে!"

ওদের গান শেষ হতে-হতে সন্ধে নেমে এল। কী সুন্দর সাজানো সব নীল রঙের নৌকো পরপর রয়েছে। মাথায় ফুলকাটা ছাউনি দেওয়া। ছাউনি থেকে চিকচিকে ঝালর ঝোলানো নৌকোয়। ভিতরে গদি পাতা। তাতে ফুলকাটা মখমলি চাদর পাতা। ঠেস দিয়ে বসার তাকিয়া অনেক। ওই নৌকায় ওঠার বায়না ধরল রান্টু-সান্টু। চারজন নৌকোয় উঠলেন। ভিতরে দুটো খরগোশ দ্রুতবেগে এদিক-ওদিক করছিল। আর অবাক চোখে ওদের দেখছিল। ওদের পোষ মানাতে লেগে গেল দু'জনে। নৌকো চলতে শুরু করল। ওপারের দিকে ঘণ্টার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

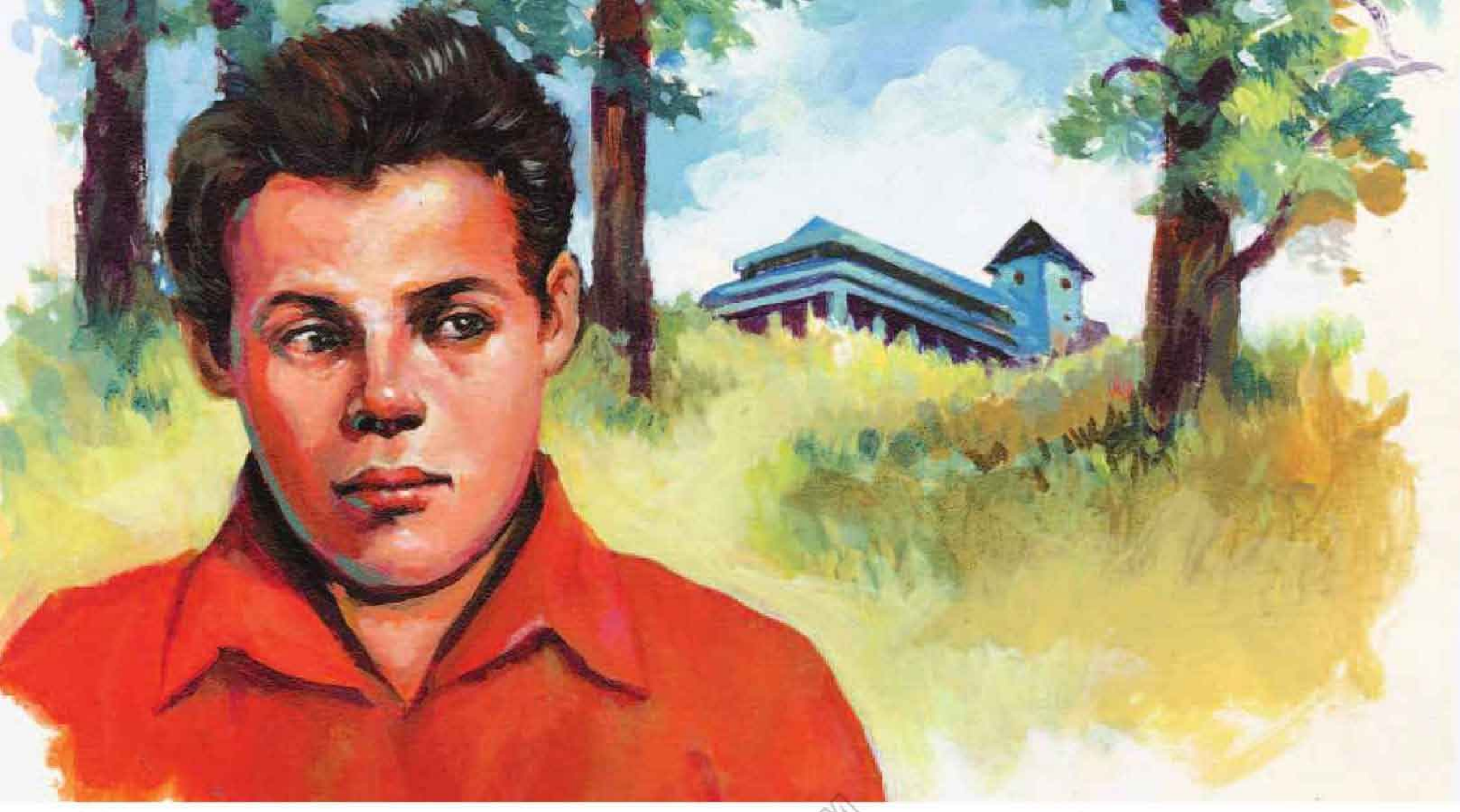

ঠুনঠুন আওয়াজ শুনে তাকালেন ইভাদেবী। অবনীশ ক্যামেরা রেডি করলেন, "দ্যাখো ঠিক যেন আর্যঋষি! ফরসা পবিত্র চেহারা। লম্বাটে মুখের সঙ্গে মানানসই লম্বা শ্বেতশ্মশ্রু। টিকালো নাক, আয়তলোচন। বামহাতে ঘণ্টা বাজিয়ে ডান হাতে একটা বিরাট গাছপ্রদীপ ধরে মন্দাকিনীকে আরতি করছেন। অন্ধকারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ওই প্রদীপের আলোতেই। পরনে অতি সাধারণ ধুতি। কতকাল ধরে এইভাবেই এখানে বেঁচে আছেন এঁরা। আশ্চর্য!"

"ঠিক বলেছ। একেবারে ঘাটের কাছে অল্পজলে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আরতিটা ভিডিও করে নিচ্ছি। এমন একটা দৃশ্য কি সহজে দেখা যায়!"

নৌকোবিহার শেষে বেশ খিদে পেয়েছে। বাড়িটাতে কিছু কেনা জিনিসপত্র রাখতে আর খাবার জায়গার খোঁজ পাওয়ার জন্য গেলেন ওঁরা। সান্টু বলল, ওর পায়ে ভীষণ ব্যথা হয়েছে। ও হেঁটে যেতে পারবে না। তাই বেরিয়ে গেলেন বাকি তিনজন। ঠিক হল ওর খাবারটা প্যাকিং করে আনা হবে।

ভোজনালয়ে প্রচণ্ড ভিড়। ওদের ফিরে আসতে রাত সাড়ে এগারোটা। অবনীশবাবু রান্টুর হাতে সান্টুর খাবারটা দিয়ে সবে নিজেদের ঘরে ঢুকেছেন। ফ্রেশ হবেন। সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে রান্টু, "মা-বাবা, সান্টু কোথায় গেল? ও তো ঘরে কোথাও নেই!"

"বলিস কী?" হইহই করে ছুটে আসেন ওঁরা, "দরজা কি খোলা ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"না, আর পারা যায় না তো এই অদ্ভুত ছেলেটাকে নিয়ে," বলেন অবনীশ, "বাইরে বের হলেই, প্রত্যেকবার একটা না-একটা কাণ্ড বাঁধাবেই। আশ্চর্য! ওর জন্য কি পাগল হয়ে যাব? সারাদিন পর এখন কোথায় একটু থাকার জায়গা মিলেছে আর এই রাত্তিরে এই অচেনা জায়গায় এখন কোথায় খুঁজব ওকে? একটা বিপদ বাঁধাতে না পারলে শান্তি হয় না ওর।" একদমে কথাগুলো বলে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন অবনীশ।

"এই ক'দিন তো এবার ভালই ছিল। ও বাথরুমে যায়নি তো?" বলেন ইভাদেবী।

"তা হলে তো ঘর খোলা রেখে যাবে না," বলে রান্টু। আর ওই দ্যাখো টিনের দরজায় ইট চাপা আর বাঁশের ঠেকা দেওয়া রয়েছে। যেমন ছিল।

"ওগো, এখন কী হবে?" যেন হাহাকার করে ওঠেন ইভাদেবী।

তবু টিনের দরজাটা খুলে বাইরে গিয়ে অনেক ডাকা হল সান্টুকে। না, সে নেই টয়লেটে।

অনেকক্ষণ ভাবনাচিন্তা করে বলে রান্টু, "আচ্ছা, আমরা ঠিক ক'দিন নিরামিষ খেয়ে আছি বলো তো বাবা?"

"হুঁ, তা দিন পনেরো তো হবেই। কিন্তু তাতে সান্টুর কী?"

"তা হলে সান্টু ঠিক চিত্রকূট পাহাড়ে উঠতে গিয়েছে।"

"বলিস কী?"

"তা ছাড়া আর কী হতে পারে? গাইড বংশীওয়ালে বললেন না যে, দিনসাতেক নিরামিষ খাওয়া কোনও লোক যদি রাত বারোটায় চিত্রকূটের মাথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তবে সে শঙ্খঘণ্টা শুনতে পাবে।"

"সর্বনাশ! এ তো মহামুশকিল হল দেখছি। কোথায় গেল একা-একা এত রাতে? যদি কোনও বিপদে..."

"শিগগির ওদের বলে পুলিশে খবর দাও," বলে কেঁদে ওঠেন ইভাদেবী।

"দাঁড়াও। পুলিশ বললেই পুলিশ। এখান থেকে কত দূরে থানা, তাই বা কে জানে? শাস্ত্রীমশাইকে একটা ফোন করি।"

॥ ৬ ॥

পুলিশ নিয়ে চিত্রকূটে

কিছু স্থানীয় লোক জোগাড় করে থানায় গিয়ে রিপোর্ট করতে রাত বারোটা বেজে গেল। আর পুলিশ নিয়ে সকলে চিত্রকূট পৌঁছলেন রাত সাড়ে বারোটায়। জোরালো টর্চ মারা হল চিত্রকূটের উপরে। চিৎকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ডাকা হল। কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। ওরা চিত্রকূটে উঠতে শুরু করল চিৎকার করে ডাকতে-ডাকতে। শেষে পুলিশ রীতিমতো বিরক্ত হয়ে ফিরে গেল। রান্টু ঘরে ফিরে একা বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল, কোথায় যেতে পারে তার বোকা ভাইটা। কোনও বিপদ হয়ে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে ওরকম খামখেয়ালি হলে। প্রাণে একটুও ভয় নেই ওর। আশ্চর্য!

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল রান্টুর। কিন্তু বাড়িতে প্রচণ্ড হইহই চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। বাইরে বেরিয়ে ও দেখল বাড়িতে অনেক লোক। একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে উঠোনটা। পুলিশ এসেছে। গৃহকর্তার খোন্তা, কোদাল, শাবল কুয়োতলাতেই পড়ে থাকে। কোনওদিন কিছু হয়নি। গতরাতে তা চুরি হয়ে গিয়েছে। ঘটনায় খুবই অস্বস্তিতে পড়লেন অবনীশবাবু ও ইভাদেবী। একে ছেলেটা নিরুদ্দেশ। গতকাল অনেক রাতে সান্টুর খোঁজে সকলে বেরিয়েছিলেন। সেই সুযোগে চোর আসেনি তো! লজ্জায় মরমে মরে যেতে লাগলেন ওঁরা।

তো খুঁজে পেতে হবে, সে যে করেই হোক! আর ঘরে থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সেও বেরিয়ে পড়ে পথে। পারলে এক দৌড়েই পৌঁছে যায় ভাইটার কাছে।

॥ ৭ ॥

অজানা পাহাড়ে সান্টু

রাত এগারোটা বেজে গেল, তবু মা, বাবা, রান্টু কেউ ফিরল না খাবার নিয়ে। কামোদ পর্বতের পিছনে কোথায় শুতেন রাম-সীতা, সেটা যে খুঁজে বার করতেই হবে সান্টুকে। না হলে শান্তি হবে না তার। লোকটা কি ঠিক বলেছে? কামোদ পর্বতকে রাম তো কথা দিয়ে গিয়েছেন, তিনি রোজ আসবেন তার কাছে। আর তার কাছে যে যা চাইবে, পর্বত তাকে তাই দিতে পারবে। বাচ্চা ছেলেরা নাকি পবিত্র। তাই তারা ভগবানকে দেখতে চায়। সান্টু যদি কামোদ পর্বতের কাছে রাম-সীতাকে দেখতে চায়, তা হলে পর্বত নিশ্চয়ই তাকে বিমুখ করবে না। ওরা কেউ ফেরেনি এখনও। এই সুযোগ! ওরা ওর কথাকে গুরুত্বই দেবে না। সুতরাং এখনই বের হয়ে পড়তে হবে।

শেষে দৌড়তে থাকে সান্টু। লক্ষণ পর্বতটা পেলেও হবে। রাম-সীতা ঘুমোলে তো লক্ষণ ওই পর্বতে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবেন তাঁদের। ছুটতে-ছুটতে অবশেষে একটা সবুজ পাহাড়ের সামনে একটা ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে দাঁড়ায় সান্টু। এটাই তো লক্ষণ পাহাড় মনে হচ্ছে। কিন্তু পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় যেন কিছু টর্চের আলো পড়ছে দেখে অবাক হয় সান্টু। তবে কি লক্ষণ স্বয়ং এসেছেন? কিন্তু এত আলো কেন?

সান্টু একটা আড়াল দেখে দাঁড়ায়। দ্যাখে আলোগুলো আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত আলো মিলিয়ে গেলে ধীরে-ধীরে পাহাড়টায় উঠতে থাকে সান্টু। একটা বেশ বড় গর্ত কাটা হয়েছে সবুজ পাহাড়ে। হাঁ করে রয়েছে লালমাটির গর্তটা। বিশাল সেই কৃত্রিম গুহার মধ্যেও যেন ধাপ কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সেই ধাপ বেয়ে কিছুটা যাওয়ার পর পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে দেখে সান্টু। তার মানে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। খুঁড়তে-খুঁড়তে যদি উপরে পৌঁছনো যায়, তবে মন্দ হয় না। একটা শাবল বা কুড়ুল যদি পাওয়া যেত! ভাবতে থাকে সান্টু।

হঠাৎ কাছাকাছি একটা কথোপকথন শুনতে পেয়ে, ভয়ে এককোণে জড়সড় হয়ে লুকিয়ে পড়ে সে।

রান্টু ভাবে, যখন সবাই বেরিয়েছে সান্টুর খোঁজে, তখন সান্টু এসে ওসব নিয়ে যায়নি তো? কিন্তু ও একা অত জিনিস নিয়ে যেতে পারে নাকি? চিত্রকূটে লালমাটি বেরিয়েছিল খোঁড়াখুঁড়িতে। কী আছে ওর মধ্যে? কেন, কারা খুঁড়ল পাহাড়টা? প্রশ্ন ছিল সান্টুর মনে। রান্টুরও ছিল। তাই কী সান্টু নিজে খুঁড়ে দেখতে গেল পাহাড়টা? নাকি কোনও দুষ্টচক্র গোপনে খুঁড়ে চলেছে পাহাড়টা! কিন্তু কেন? আর তারাই কি সুযোগ পেয়ে ওগুলো নিয়ে সটকান দিল কাজের সুবিধের জন্য?

সান্টু ওদের হাতে পড়ে যায়নি তো কৌতূহল মেটাতে গিয়ে? রান্টুরও কি মনে কম কৌতূহল নাকি? তাই বলে সম্ভব-অসম্ভবের কথা না ভেবে কাজ করা কি উচিত বাবা, মা, দাদাকে কষ্ট দিয়ে। এখন কী করা যায়, ভাবতে থাকে রান্টু। ভাইটাকে

একছুটে বেরিয়ে পড়ে সান্টু বাড়ির পাঁচিল টপকে। খুঁজে-খুঁজে সে পেয়ে যায় মন্দাকিনী নদীর ভরতঘাট, রামঘাট আর লক্ষণঘাটও।

চিত্রকূটের তো মুখ এদিকে। এদিকটা দিয়ে পিছনে যাওয়া যায় না। ঘেরা পুরোটা। তা হলে যেদিকে নিয়ে গিয়ে বংশীওয়ালেজি তিনটে পর্বত পরপর দেখিয়েছিলেন, সেই দিকেই যেতে হবে সান্টুকে। রাম-সীতা ত্রেতা যুগের লোক। সারাদিন ধরে ফলমূল সংগ্রহ করার ধকল কি কম? এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু পাথরে শোওয়া যায় কি করে খোলা আকাশের নীচে? ঝড়-বৃষ্টি এলে থাকবে কী করে? নিজে তো ভগবান, ভাল করে থাকার জায়গা তৈরি করে নিতে পারেননি কেন?

কিন্তু অত দূরে যাবে কী করে সান্টু? চিরসঙ্গী ছোট্ট টর্চটাকে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে

॥ ৮ ॥

সান্টুর কীর্তি

অনেকটা খুঁড়েছিল সান্টু পাহাড়ে ফেলে যাওয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে। অনেকটা ভিতরে ঢুকেও গিয়েছিল সে। হঠাৎ কাছাকাছি একটা কথোপকথন শুনতে পেয়ে, ভয়ে এককোণে জড়সড় হয়ে লুকিয়ে পড়ে সে। তবে কি যারা একটু আগে এখানে টর্চ মেরে কিছু করছিল, তারাই কি ফিরে এল আবার? ওরাই কি খুঁড়েছে এতটা? কেন? ওরা কি খারাপ লোক? ওরাও কি তার মতো রাম-সীতাকে দেখতে ওদিকে যেতে চায়? এজন্যই খুঁড়ছিল জায়গাটা? মনে হয় না। তবে? এখন কী করবে সান্টু? হ্যাঁ, একটা খোঁড়াখুঁড়ির শব্দ তো ভেসে আসছে।

"আরে মেজরসাহেব, খুব সহজেই খোঁড়া যাচ্ছে এবার।"

"বললাম না আপনাকে তখন, লালমাটি খোঁড়া ও যন্তরপাতির কম্মো নয়। ওর জন্য চাই এরকম যন্ত্রপাতি।"

"আমি তা বলিনি ক্যাপ্টেন। আসলে মাটি একটু আলগা হয়ে আছে দেখছি। কেউ বোধ হয় অস্ত্র চালিয়েছে এখানে আর তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে একটু-আধটু ফাঁকফোকরও তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাই আমাদের যন্ত্র একটু চালাতেই ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে মাটি।"

"বলেন কী মেজর? এখানে আবার কে খুঁজতে আসবে?"

"চিন্তা করবেন না। কেউ এখানে আসবে না। যদি এসেও পড়ে তাকে আর প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না।"

সর্বনাশ! এরা তো সাঙ্ঘাতিক লোক! ভাবে সান্টু। এই পাহাড়টাকে কেন খুঁড়ছে কে জানে! আগে এদিকটা ওরাই খুঁড়েছিল তা হলে। মনমতো হয়নি বলে যন্ত্রপাতি আনতে গিয়েছিল। সান্টুর খোঁড়ার উপর খুঁড়ছে ওরা? কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। ওরা যদি তাই করে শিগগিরই চলে আসবে ওর কাছে। এখন কী বেরোবে সান্টু? বড় ভুল করে ফেলেছে সে। একা এত দূরে কাউকে না জানিয়ে চলে এসে। এখন চাইলেও কাউকে খবরও দেওয়া যাবে না। ওরাও সহস্র চেষ্টাতেও খুঁজে পাবে না ওকে। চরম বিপদে পড়লেও এখন উদ্ধার করতে পারবে না কেউই ওকে। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে সান্টু।

॥ ৯ ॥

রান্টু কোথায়

না, ভাইটার গায়ে একফোঁটা আঁচড় লাগতেও দিতে পারে না রান্টুর মতো বুদ্ধিমান আর সাহসী ছেলে। তাই দৌড়চ্ছিল রান্টু প্রাণপণে। সে ওই সবুজ পাহাড় যেগুলো কে বা কারা খুঁড়ে লালমাটি বের করে ফেলেছে, ছুটতে থাকে সেগুলোরই উদ্দেশে। একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামল সে। ভাই যদি চিত্রকূটে শঙ্খঘণ্টা শুনতে গভীর রাতে না গিয়ে থাকে, তবে সে খোঁড়াখুঁড়ি দেখতে পর্বতেই এসে থাকবে। পথে গাড়িতে আসতে-আসতে ওইগুলোর সম্পর্কেই তো প্রশ্ন করেছিল সান্টু।

চারদিকে কেউ আছে কিনা, ভাল করে দেখে নেয় রান্টু। তারপর পাহাড়টার পাদদেশে প্রণাম করে তবেই তাতে পা ছোঁয়ায় সে। অতি সন্তর্পণে পাহাড়ে উঠতে থাকে রান্টু। কে জানে কী করছে এখন সান্টু! হঠাৎ খোঁড়া জায়গা আরও খোঁড়ার শখ যে কেন হল তার, কে জানে তা?

গতবার পোখরায় যে কাণ্ডটিই না করেছিল সে! কাউকে কিছু না বলে প্রায় খালি হাতেই সুড়ঙ্গ আবিষ্কারের জন্য বেরিয়ে পড়েছিল সে অনিশ্চিতের পথে। এই একগুঁয়ে ভাইটাকে নিয়ে আর পেরে ওঠে না রান্টু।

পোখরার ঘটনা মনে পড়তেই একেবারে নিশ্চিত হয়ে ওঠে রান্টুর মন। এখানেই এসে থাকবে তার গুণধর ভাইটি। মনে-মনে রাগ হয় ওর সান্টুর উপর। তবে ভাইটি এমন অ্যাডভেঞ্চারাস মাইন্ডের হওয়ায় ওরও বুদ্ধি খোলে। অভিজ্ঞতাও হয়। একেবারে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। রাম বা বিষ্ণুকে তো মনে-মনে প্রণাম করে নিয়েছে সে। সফল সে হবেই। ভেবে নিয়ে দ্রুত পাহাড়টার উপরে উঠতে থাকে সে।

লাল গর্তটার সামনে পৌঁছে একেবারে রামঅবাক বেচারা রান্টু। কিছুটা সুড়ঙ্গ (হাতখানেকও নয়) যাওয়ার পরেই একটা পাথরের স্ল্যাব দিয়ে আটকানো হয়েছে পথটাকে। কিন্তু কেন?

আস্তে-আস্তে স্ল্যাবটাকে গড়িয়ে বের করে আনে রান্টু। তারপর সামলে নিয়ে ওটাকে দু'হাতে তুলে নীচের দিকে ছুড়ে দেয় বেশ জোরেই। সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন চিৎকার করে উঠল? সর্বনাশ! যারা এটা খুঁড়েছে এবং স্ল্যাবটাকে খোঁড়া জায়গায় ঢুকিয়েছে, তাদেরই কেউ কি ছিল নীচে ওদিকটাতে? ওকে দেখে ফেলেনি তো আবার? কিন্তু কিছু বলেনি তো ওকে! এখানে যাই ঘটুক না কেন, সান্টুর খোঁজ তো করতেই হবে রান্টুকে। তাই সে সুড়ঙ্গের ভিতর নামতে শুরু করে। ধাপে-ধাপে পথ কাটা রয়েছে। সোজাসুজি। কিছুক্ষণ নামার পর সোজাপথ আর নেই। বাঁক নিতে-নিতে এক জায়গায় এসে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে পথটা। কোনদিকে যাওয়া উচিত হবে? একদিকে পথ ধাপে-ধাপে কাটা। অন্যদিকে কেমন এবড়োখেবড়ো কোনও সিমেট্রি নেই। সান্টু খুঁড়লে তো এরকমই খুঁড়বে। তা হলে ওই পথেই যেতে হবে ওকে। ভাবে রান্টু। কিন্তু ওদিকটা অত গভীর পর্যন্ত খুঁড়ল কারা? এর ভিতর নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে।

সে যাই হোক, সান্টুকে আগে খুঁজে বের করাটা প্রয়োজন তার। কোথাও গড়িয়ে, কোথাও বসে পড়ে, শরীরটাকে কোনাকুনি বাঁকিয়ে নানা ভাবে অবশেষে সে এসে পৌঁছয় একটু বড় পরিসরের একটা জায়গায়।

"উঁ!" কে? আরে সান্টু না! ওর একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে রান্টু। একটু আহত হলেও সান্টু একেবারে আহ্লাদে আটখানা সান্টুকে পেয়ে।

"তুই এসে গিয়েছিস!" এমন ভাবে বলে সান্টু যেন রান্টুকে তার সন, তারিখ, ঘণ্টা, মিনিট মেপে কোথায় আসতে হবে তাও বলা ছিল! মনে-মনে ভীষণ রাগ হয় রান্টুর।

"দ্যাখ সান্টু, তোর জন্য বারবার এরকম বিপদের পথে পা বাড়ানো সম্ভব নয়। তা হঠাৎ এই পাহাড় খুঁড়তে শুরু করলি যে!"

"আমি আগে খুঁড়িনি। একটু খোঁড়া ছিল। আমি খুঁড়তে-খুঁড়তে কিছুটা ভিতরে পৌঁছানোর পর কাদের যেন চাপাস্বরে কথা বলতে শুনেছি। তখন ভয়ে-ভয়ে একটা কোণে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বসে থেকেছি। ওদের খোঁড়াখুঁড়ির শব্দও কানে এসেছে। যখন শব্দ বন্ধ হয়েছে, তখন আমি আবার খুঁড়তে-খুঁড়তে এই পর্যন্ত এসেছি।"

"তুই কি আরও খুঁড়তে চাস নাকি অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ চাই।"

"কিন্তু কেন?"

"কেন বংশীওয়ালাজি বললেন শুনলি না এই পাহাড়ের পিছনে দুটো বড় পাথরের উপর রাম আর সীতা আজও শুয়ে থাকেন।"

"তুই খুঁড়তে-খুঁড়তে ওপারে যেতে চাইছিস তো?"

"তাই তো ঠিক করেছি।"

"একটা আস্ত পাগল! কতদিন লাগবে তা জানিস? আর রাম-সীতাকে যে আমরা দেখতে পাব না, এটাও যে বংশীওয়ালাজি বলেছেন তা মনে নেই তোর?"

"আচ্ছা সান্টু এই চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্চয় পেটে কিছু পড়েনি তোর?"

"হ্যাঁরে, খুব খিদে আর জলতেষ্টা পেয়েছে।"

"এই নে, বিস্কুট আর জল খেয়ে নে।"

"নিচ্ছি, কিন্তু তারপর?"

"সেসব পরেই না হয় ভাবা যাবে।"

॥ ১০ ॥

সুড়ঙ্গে বিস্ময়

"শোন সান্টু, আমি আসতে-আসতে দেখলাম কী সুন্দর ধাপে-ধাপে পাথর কেটে ঠিক উলটো দিকে একটা সুড়ঙ্গ পথ চলে গিয়েছে। আমাদের উপরে উঠে ওখানে পৌঁছতে হবে। তারপর ওই পথে নেমে গিয়ে দেখতে হবে পথটা কোথায় শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে আর কী আছে সেখানে।”

“ওরে বাবা! না-না রান্টু না। লোকগুলোর গলার স্বর শুনেই বুঝেছি ওরা খুব ভয়ঙ্কর। আর পথটা তো ওরাই তৈরি করেছে।”

“তা হোক। এত দূরে এসেছি যখন, তখন রহস্যের শেষ না দেখে পালানো চলবে না আমাদের। আর ওপথে নাই বা গেলি, সোজা পথেই বা বাইরে বের হবি কী করে? বাইরে নীচে ওদের পাহারা রয়েছে না? তুই কী জানিস সুড়ঙ্গের পথটা একখানা পাথর দিয়ে আটকানো ছিল?”

“সে কীরে?” নিজের অজান্তে এ কোন মৃত্যু গহ্বরে ঢুকে পড়েছে সে? ভেবেই হাত পা অবশ হয়ে যায় সান্টুর। থরথর করে ভয়ে কাঁপতে থাকে সে।

“হ্যাঁ। আমি তো ওটা সরিয়ে দিয়ে তবে ঢুকেছি ভিতরে।”

“তাই নাকি?” কণ্ঠস্বর কাঁপছে সান্টুর। ওর অবস্থা দেখে বাকি পথটা আর কথা বলে না রান্টু। মনে-মনে ভাবে সে, পাহারাদারটাকে নিজের অজান্তেই ঘায়েল করে একটা ভাল কাজ করে ফেলেছে রান্টু। ওই উলটো দিকের সুড়ঙ্গে ঢোকার জন্য হাতে কিছুটা সময় পাওয়া গেল।

দু’জনে উপরে উঠে এসে সেই জায়গাটায় পৌঁছয়, যেখান থেকে দু’দিকে দুটো সুড়ঙ্গপথ চলে গেছে। এবার ধাপে ধাপে শুধু নেমে চলা। ওরা নামছে তো নামছেই। অনেকটা নেমে গিয়ে যেখানে পৌঁছল সেটাতে রীতিমতো একটা কক্ষ। ভিতরে মৃদু মোমের প্রদীপের আলো।

“এ কী! এ যে,” একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে দুই ভাই। খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রে দেখা এক দেবদেবীর মূর্তির অনুরূপ একটা মূর্তি! এখানে এল কী করে? খাজুরাহোর মূর্তিগুলো যারা দেখেছে, তাদের তা চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়। মন্দিরের যে পাশে ওই যুগল মূর্তি দেখেছে ওরা তার উলটো দিকটা ফাঁকা লক্ষ করেছে রান্টু। ওখানে ওরকমই একটা থাকবার কথা। কিন্তু নেই।

“দেখেছিস রান্টু, সেই জীবন্ত মানুষের গায়ের মতো মসৃণ মুন্ডুহীন মূর্তিটার মাথাটা যেন ওইটাই হবে। হাত দিলে একই রকম রোমাঞ্চ জাগছে শরীরের মধ্যে।”

“আরে দেখ না ওই যে গয়নাপরা দুটো হাত কী পেলব! এ খাজুরাহোর সেই সুন্দর দুই মূর্তিটার একটা না হয়ে যায় না।”

“আমাদের এবারে উপরে উঠতে হবে সান্টু।”

“কে-ন?” আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সান্টু।

“এখানে থাকলে বিপদ আরও বেশি। রাত হওয়ার বেশি বাকি নেই। ওরা ফিরে এল বলে। ওগুলো পাচার করতে হবে না? তা ছাড়া পাহারাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। আমি তো তাকে...”

প্রচণ্ড ভয়ে রান্টুকে জড়িয়ে ধরে সান্টু।

“চল, কোনও ভয় নেই আর। চল। আমি তো তোর সঙ্গে আছি। তুই তো আর একা নোস।”

দু’জনে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছনোর পর একটা লাল কাপড় ওড়ায় রান্টু। সঙ্গে-সঙ্গে কারা যেন সবুজ পতাকা ওড়ান নীচ থেকে। তারপর গটগট করে উঠতে থাকেন উপরে। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী! দু’জন ওদের রেসকিউ করে নিয়ে যান। বাকিরা নেমে যান রান্টুর পথনির্দেশ অনুযায়ী সুড়ঙ্গের মধ্যে।

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

ম জা র ঝাঁ পি

মূকাভিনয় প্রযোজনা

ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটার সম্প্রতি মঞ্চস্থ করল তাদের নতুন প্রযোজনা ‘ছিনাথ বহুরূপী’। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পটি তো সকলেরই জানা। সেই চেনা গল্পটিকেই মূকাভিনয়ের মাধ্যমে আবার দেখল দর্শকরা। একটি কথাও না বলে গল্প ফুটিয়ে তোলাই মূকাভিনয়ের মুনশিয়ানা। নিরঞ্জন গোস্বামীর পরিচালনায় এখানে কুশীলবরা সকলেই ভাল অভিনয় করেছেন। হারমোনিয়াম, খঞ্জনির সঙ্গতে নাটকের আবহ ভারী সুন্দর। এই সময়ের ছোটরা তো জানেই না বহুরূপী কারা! এই নাটকের মধ্যে দিয়ে তারা প্রাচীন লোকশিল্পী বহুরূপীদের জানতেও পারবে।

জাতীয় পুতুল নাচ উৎসব

সম্প্রতি ‘জাতীয় পুতুল নাচ উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতায়। মধুসূদন মঞ্চে উৎসবের শুভ সূচনা করেন পূর্ণদাস বাউল। কলকাতা, দিল্লি, ওড়িশা, রাজস্থানের বিভিন্ন পুতুল নাচের দল উৎসবে অংশ নেয়। পাঁচদিন ধরে চলা উৎসবে কীভাবে পুতুল তৈরি হয়, ছোটদের তা হাতেকলমে শেখানোর ব্যবস্থাও ছিল। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় কলকাতার ‘ডলস থিয়েটার’ এই উৎসবের মূল আয়োজক। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সুদীপ গুপ্ত জানালেন, “ছোট, বড় সকলের কাছেই সুস্থ রুচির বিনোদন তুলে ধরতেই এই প্রচেষ্টা।” উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজস্থানের ‘আকর পাপেট থিয়েটার’ পূরণ ভাটের পরিচালনায় ‘ঢোলা মারু’ পুতুল নাটক মঞ্চস্থ করে।

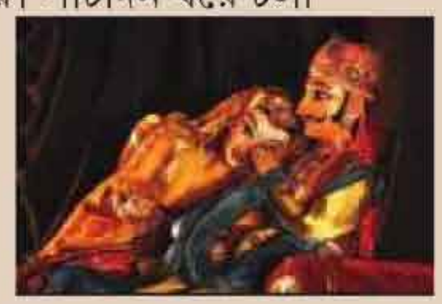

স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী

টাকি হাউস (বয়েজ) স্কুল সদ্য পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করল। সেই উপলক্ষ্যেই ১৩ এপ্রিল সকালবেলা স্কুলের সামনে থেকে একটি জমকালো শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। স্কুলের নতুন-পুরনো ছাত্রদের সঙ্গে এই পদযাত্রায় পা মেলালেন অন্যান্য স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও সমাজের গুণীজনেরাও।

মজা রাশি-রাশি

ক্লাস সেভেনের মতিরামের অঙ্কে বড় ভয়। প্রায়ই তাকে হেনস্থা হতে হয় ‘অঙ্কের জাহাজ’ বিপদতারণস্যারের হাতে। একদিন মতি এমন বুদ্ধি বের করল, যাতে সহজ করে অঙ্ক শেখানোর সংকল্প নিতে বাধ্য হলেন বিপদতারণস্যার। এদিকে ডিসেম্বরের হাড়কাঁপানি শীতে মুচকুন্দপুর গ্রামে রুগি দেখতে গিয়ে ঠাকুরদা পড়লেন রকমারি ভূতের পাল্লায়। ছেলেধরা ভেবে বাঁশিবাজানো জাদুকরকে মেরে আধমরা করে দিল গ্রামের লোক। জুতো চুরি গেল ভুতোমামার। রহস্যের সমাধান হল সোনার কলমের। কথা বলা ময়না পাখির জন্য সুমনের মন খারাপ করল। এত সব ঘটনা নিয়েই তরুণকুমার সরখেল লিখে ফেললেন মজার একটি বই।

অঙ্কের ভূত

প্রকাশক: সঞ্চিতা। দাম ৫০ টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০ এপ্রিল থেকে ৪ মে এই ১৫ দিনে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে ঘটেছে নানা রকম ঘটনা। তারই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা এই সংখ্যায়।

মান্না দে

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা

- ২২ এপ্রিল, ১৯৮২ ব্রাজিলের ফুটবল তারকা কাকার জন্মদিন।
- ২৪ এপ্রিল, ১৯৭৩ ক্রিকেটের রাজপুত্র সচিন তেন্ডুলকরের জন্মদিন।
- ২৯ এপ্রিল, ১৯৩৬ যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী এবং সঙ্গীত পরিচালক জুবিন মেটার জন্মদিন।
- ৩০ এপ্রিল, ১৮৭০ ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রাণপুরুষ দাদাসাহেব ফালকের জন্মদিন।
- ১ মে, ১৯১৯ সঙ্গীতশিল্পী মান্না দে-র জন্মদিন।
- ৩ মে, ১৯৩৯ কংগ্রেস ছেড়ে নতুন রাজনৈতিক দল 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।
- ৪ মে, ১৭৯৯ শ্রীরঙ্গপত্তনমের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন মহীশূরের মহারাজ টিপু সুলতান।

27 APRIL

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণভেদ মুছে সাধারণ নির্বাচন

● দীর্ঘ সাতাশ বছর কারাগারে কাটিয়ে, ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তি পেলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন বর্ণবৈষম্যের কালো অন্ধকারকে পিছনে ফেলে, নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। দেশজুড়ে নতুন ভাবে সাধারণ নির্বাচন, প্রদেশের বিধানসভার নির্বাচন এবং পুরসভার নির্বাচন করতে, ১৯৯৩ সালে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হল। ১৯৯৪ সালের ২৭ এপ্রিল গোটা দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে ভোট দিল সাধারণ মানুষ। ৪০০ আসনের 'ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি'র নির্বাচনে অংশ নিলেন প্রায় ২০ কোটি মানুষ। সাদা-কালোর বর্ণভেদ মুছে দিয়ে সেবারই প্রথম ভোট দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার 'কালো' মানুষেরা। ভোটে নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস পেল ২৫২টি আসন। তবে অধিকাংশ জয়ী রাজনৈতিক দলগুলো মিলিত ভাবে জাতীয় সরকার গঠন করল সেবার। তারাই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করলেন নেলসন ম্যান্ডেলাকে।

AMARBOI.COM

2 MAY

সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন

● বাংলা এবং বাঙালির শ্রেষ্ঠত্বকে যাঁরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে মেলে ধরেছেন, সত্যজিৎ রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। চলচ্চিত্র, সঙ্গীত পরিচালনা, অলঙ্করণ, গল্প, উপন্যাস তাঁর শিল্পীমন এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই, অনন্য এক নজির স্থাপন করে গিয়েছে। আসলে, দাদু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং বাবা সুকুমার রায়ের কাছ থেকেই এই শিল্পীসত্তা সত্যজিৎ পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। ২ মে, ১৯২১ সালে কলকাতায় এক ব্রাহ্ম পরিবারে সত্যজিতের জন্ম। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতি নিয়ে বি এ পাশ করে বিশ্বভারতীতে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে, কর্মসূত্রে তখন লন্ডনে সত্যজিৎ। সেই সময় 'বাইসাইকেল থিফ' নামে একটা ছবি তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করে ছবি পরিচালনা করতে। দেশে ফিরে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তৈরি করলেন 'পথের পাঁচালি'। তারপর বাকিটা ইতিহাস। বিশ্ব সিনেমায় অনির্বাণ অবদানের জন্য ১৯৯২ সালে তাঁকে 'অস্কার' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সেবছরই পেলেন 'ভারতরত্ন'। আর কিশোর মনের খোরাক জোগাতে, লেখক সত্যজিতের অমর সৃষ্টি ফেলুদা আর প্রোফেসর শঙ্কুর জনপ্রিয়তায় আজও এতটুকু ভাটা পড়েনি।

23 APRIL

গেলের ধুন্ধুমার ব্যাটিং রেকর্ড

● গত বছর ২৩ এপ্রিল, ষষ্ঠ আই পি এল-এর ৩১ নম্বর ম্যাচ। চেন্নাইয়ের চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সেদিন মুখোমুখি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার বেঙ্গালুরু (আর সি বি) আর পুণে ওয়ারিয়ার্স। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং নিল ওয়ারিয়ার্স। আর তখনই বোধ হয় ক্রিকেট দেবতা একটু মুচকি হাসলেন। কারণ তারপর মাঠে যা হল, তাকে 'ব্যাটিং তাণ্ডব' বললেও কম বলা হয়। আর সি বি-র হয়ে প্রথম উইকেটে ক্রিস গেল আর তিলকরত্নে দিলসান তুললেন ১৬৭ রান। তার মধ্যে দিলসানের সংগ্রহ ৩৩ রান। ৩০ বলে আটটা চার আর ১১টা ছয় মেরে টি-টোয়েন্টির দ্রুততম সেঞ্চুরিটি হাঁকালেন গেল। ১৩টা চার আর ১৭টা ছয় মেরে মাত্র ৬৬ বলে ১৭৫ রান করে অপরাজিত থাকলেন তিনি। টি-টোয়েন্টির এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের সেই রেকর্ড আজও অটুট। ১৩০ রানে আর সি বি ম্যাচটি জিতে নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথী সেনগুপ্ত

টুংটাংয়ের দুপুর

মা বললেন, "টুংটাং দুপুরবেলা একদম টো-টো করবে না। চুপটি করে আমার পাশে শুয়ে ঘুমোবে। বিকেলে হাত-মুখ ধুয়ে আমার কাছে অঙ্ক নিয়ে বসবে।"

টুংটাং তার ঝুমঝুমি চুলসুদ্ধু মাথা নাড়িয়ে বলল, "একটুও না। আমার ঘুম পায় না। আমি আমার পুতুলগুলো নিয়ে খেলতে বসব।"

মা তো শুনে রেগে আগুন। "দিন-দিন তোমার সাহস বেড়ে যাচ্ছে। আজকাল মুখে-মুখে কথা বলতেও শিখেছ। আসুক তোমার বাবা। সব বলব। আর কথা না শুনলে দেবও কয়েক ঘা। এত দুষ্টু হয়েছ!"

টুংটাং এবার চুপ করে। বাবাকে সে কিছুটা রেয়াতও করে। বাবা উৎপল এখানকার উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। বড়-বড় ছেলেদের ফিজিক্স আর অঙ্ক পড়ান। ভীষণ গম্ভীর। কিন্তু কখনও টুংটাংয়ের গায়ে হাত তোলেন না। খুব জোরে ধমক দিয়ে বকেনও না। ওদিকে মা কিন্তু টুংটাং দুষ্টুমি করলে দুমদাম কয়েক ঘা বসিয়ে দেন, ভীষণ জোরে বকুনি দেন। তবু টুংটাংয়ের ভাব কিন্তু মায়ের সঙ্গেই বেশি। কারণ, মা টুংটাংয়ের পছন্দমতো টিফিন তৈরি করে দেন, সুন্দর-সুন্দর ফ্রক তৈরি করে পরান, স্কুলের স্ক্র্যাপ বুকে ছবি আটকাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্য করেন, মনমেজাজ ভাল থাকলে চমৎকার গল্পও শোনান। কিন্তু তাতে তো টুংটাংয়ের দুষ্টুমি কমে না। স্কুলে ক্লাস টু-তে পড়ে সাত বছরের টুংটাং। লেখাপড়ায় সে মোটামুটি ভালই। তবু প্রায়ই তার নামে স্কুল থেকে অভিযোগ আসে। নানা রকম দুষ্টুমি সে ওখানেও করে বেড়ায়। অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মারপিট করে। তাদের জিনিস লুকিয়ে রেখে দেয়। এই তো সেদিন টিফিনের সময় সবাই মিলে লুকোচুরি খেলছে। ওদের বন্ধু শান্তশিষ্ট বাবলি চোর সেজেছে। বেচারা এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে, কাউকেই খুঁজে পাচ্ছে না। এমন সময় কোথা থেকে এসে টুংটাং এমন জোরে বাবলির পিঠে ধাপ্পা মারল, রোগা-পাতলা বাবলি একেবারে ককিয়ে উঠল। তারপর কাঁদতে শুরু করল। অন্যরা ছুটে এল, খেলা গেল ভেঙে। অন্য ছেলেমেয়েরাও টুংটাংয়ের উপর রেগে গেল। সবাই মিলে খেলা থেকে টুংটাংকে বাদ দিয়ে দিল। তখনও টিফিনের খানিকটা সময় বাকি। টুংটাংকে বাদ দিয়ে ওরা নতুন খেলার জন্য গুনতে লাগল, "উবু দশ কুড়ি..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুংটাংয়ের খুব রাগ হল। ছুটে খেলার মাঠ ছেড়ে চলে এল স্কুলের অফিসঘরের সামনে। সেখানে অফিসঘরে নিতাইকাকু দিনরাত লেখালেখি করেন। হরিয়াদাদা লম্বা রেজিস্টারে কী সব লিখিয়ে নিয়ে দিদিমণিদের দেখায়। মাঝে-মাঝে ক্লাসে গিয়ে বলে আসে ছুটিছাটার কথা। অফিস ঘরের ভিতরেই নীল পরদা টানা বড়দিদিমণির ঘর। তাতে কালো চশমা পরা, খোঁপা বাঁধা, সাদা শাড়ি পরা বড়দিদিমণি গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন। আর বড় দিদিমণির ঘরের বাইরে উঁচু টুলে বসে থাকে রামকানাই বেয়ারা। ক্লাস শেষ হলে ঢং ঢং করে বড় পিতলের ঘণ্টাটাকে বাজায় সে। টুংটাং সেখানে এসে দেখল, নিতাইকাকু আর হরিয়াদাদা চা খেতে-খেতে কী সব গল্প করছে। আর রামকানাই গিয়েছে অন্য দিদিমণিদের চা দিতে। টুংটাং তখন রাগে ফোঁসফোঁস করছে। "দাঁড়া, তোদের দেখাচ্ছি কী করে খেলিস তোরা," এই বলে পিতলের ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল ঢং ঢং করে। ব্যস! সারা স্কুলে হইহই কাণ্ড। টিফিন শেষ হয়েছে ভেবে সবাই ছুটোছুটি করে ক্লাসে ঢুকতে লাগল। দিদিমণিরাও অবাক। তাঁরা সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছেন, সঙ্গে-সঙ্গে ঘণ্টা পড়ে গেল! সবচেয়ে অবাক রামকানাই। সে তো দিদিমণিদের ঘরে চায়ের ট্রে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে! এখনও সকলকে চা দেওয়াও শেষ হয়নি। তো ঘণ্টা বাজাল কে? বড়দিদিমণি অবাক হয়ে ভারী নীল পরদা সরিয়ে, বাইরে বেরিয়ে দেখতে এলেন কী ব্যাপার। এসে দেখেন ছোট্ট টুংটাং দাঁড়িয়ে আছে ভারী ঘণ্টাটা হাতে নিয়ে। ব্যস, একেবারে হাতেনাতে ধরা! সঙ্গে-সঙ্গে আবার হইহই করে ছেলেমেয়েদের দশ মিনিটের জন্য টিফিন খেতে দেওয়া হল। এসব ঝামেলায় টিফিনের পরের পিরিয়ডটা ঠিকমতো হলই না। বড়দিদিমণি খুব রেগে গেলেন টুংটাংয়ের উপর। তাই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন নীল পরদাওয়ালা দরজার পাশে। তারপর বাড়িতে ফোন করে টুংটাংয়ের মাকে দেখা করতে বললেন।

টুংটাংয়ের মা রোজই মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে যান। আজ স্কুল থেকে জরুরি তলব পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটলেন। সেখানে গিয়ে সব শুনে লজ্জার একশেষ। সারা রাস্তা মেয়েকে বকতে-বকতে বাড়ি এলেন। "ছি ছি! এত দুষ্টু মেয়ে! লেখাপড়ার নাম নেই! মাথা ভর্তি যত কুবুদ্ধি। এখনই এমন, বড় হলে যে কী হবে! আজ আসুক তোমার বাবা, সব বলব আমি। তারই আহ্লাদে তুমি এমন মাথায় উঠেছ!"

এ তো শুধু একটা ঘটনা। এমন নিত্যনতুন দুষ্টুমি টুংটাং করেই চলেছে। আর একদিন ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া লাগল। তারপর সবাই লাইন করে চলে গেল প্রেয়ার করতে। টুংটাং তখন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইল। ক্লাস খালি হলে ওদের ব্যাগ থেকে টিফিন বক্স বের করে টিফিনগুলো ফেলে দিল জানলা দিয়ে। রাজ্যের যত কাক এসে খেয়ে গেল টিফিন। তাতেও শান্তি হল না। ওদের ফার্স্ট বয়ের হোমওয়ার্কের অঙ্ক খাতা খুলে তাতে সুন্দর ভাবে করা অঙ্কের উপর কলম খুলে কালি ঢেলে ফেলল। তাপর চুপিচুপি স্কুলের ইনফার্মারিতে পেট ব্যথা বলে শুয়ে রইল। পরে ছেলেমেয়েরা ক্লাসে ফিরে এসে হইহই কাণ্ড বাঁধাল। তখন টুংটাং তো নেই! তখন সন্দেহ প্রকাশ করাতে ইনফার্মারির নার্স দিদি বলল, "ও তো সকাল থেকেই পেট ব্যথা নিয়ে শুয়ে আছে। আমি তো ওকে ওষুধ দিলাম।"

পরে ফিরে এসে ওরও টিফিন নেই বলে নাকে কান্না কাঁদল। ফলে এত বড় দুষ্কর্মটার জন্য কে দায়ী, সেটা কেউ জানলই না। ঠাম্মা বলেন, "ছি ছি! কী কপাল করেছিলে বউমা! মেয়ে সন্তান এত দুষ্টু হয়? তুমি ওকে জোর করে ঘুম পাড়াবে। নইলে সারা দুপুর ওর মাথায় কুবুদ্ধির চাষ হয়।"

কিন্তু দুপুরবেলা যে একফোঁটা ঘুম পায় না টুংটাংয়ের। মা বলেন, "কী করে যে পারিস! একটুও টায়ার্ড হোস না? সেই তো ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠিস, এতক্ষণ স্কুলে কাটাস, তারপর দুপুরে একটু না ঘুমোলে চলে?"

কে শোনে কার কথা! দুপুরে ঘুমোলে আইসক্রিমওয়ালার কাছ থেকে কমলা রঙের আইসক্রিম কে কিনবে? আর ছাদের উপর খোপ কেটে এক্কাদোক্কাই বা খেলবে কে? তবে একটা ব্যাপারে টুংটাং ঠান্ডা হয়ে যায়। সেটা হল গল্প শোনা। মা ওকে অনেকবার চেষ্টা করেছেন গল্পের বই পড়ার অভ্যেস করাতে। কিন্তু টুংটাংয়ের অত ধৈর্য নেই।

তবে গল্প যদি কেউ চমৎকার ভাবে বলে, তা হলে টুংটাং এক্কেবারে চুপ। কিন্তু সারাদিন গল্প বলে ওকে চুপ করিয়েই বা রাখবে কে? লোকের কি খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই! মা কখনও- কখনও বলেন। কিন্তু মায়েরই বা সময় কোথায়? ঠাম্মা গল্প বলতে ভালবাসেন না। তাঁর পছন্দ অবসর সময়ে সেলাই-বোনা ইত্যাদি করা। এছাড়া চমৎকার আচার তৈরি করেন। যে আচার রোদে দেওয়া হলে, টুংটাং চুপচাপ হাপিস করে দেয়। তা নিয়ে প্রবল চেঁচামেচি করেন উনি। কিন্তু এগুলোই তো টুংটাংয়ের দ্বিপ্রাহরিক কাজ।

আর-একটা কাজ আছে টুংটাংয়ের। সেটা হল পাশের বাড়ির দাদুর ঘরে হঠাৎ হঠাৎ হানা দেওয়া। পাশের বাড়ির দাদু লোকটা অদ্ভুত। একাই থাকেন। দিদা মারা গিয়েছেন অনেকদিন। দাদুর এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দুর্গাপুরে শ্বশুরবাড়ি। কখনও-কখনও দাদুকে দেখতে আসে। আর এক ছেলে, সে চাকরি করে চেন্নাইয়ে। সে-ও চট করে আসতে পারে না। কিন্তু দাদু একাই বেশ আছেন।

টুংটাংদের বাড়ির পাশে দাদুর ছোট্ট একতলা বাড়ি। সামনে একটু বাগান। সেখানে দাদু নিজের হাতে মাটি কুপিয়ে মরসুমি ফুলের গাছ লাগান। ঘরদোর খুব পরিষ্কার রাখেন। কানাইয়ের মা বলে একজন মাসি এসে দাদুর ঘরদোর পরিষ্কার করে চলে যায়। কিন্তু নিজের রান্না দাদু নিজেই করেন। মানুষটা খুব হাসিখুশি। কক্ষনও কারও উপর রাগ করেন না। এজন্য সবাই তাঁকে ভালবাসে। মা মাঝে-মাঝে ভাল-মন্দ কিছু রান্না করলে বাটি করে দাদুকে দিয়ে আসেন। আর উনি তাতেই যে কী খুশি হন! কত প্রশংসা করেন মায়ের রান্নার! টুংটাংয়ের খুব পছন্দ দাদুকে। সব চেয়ে ভাল লাগে এই ভেবে যে দাদু

টুংটাংয়ের খুব রাগ হল। ছুটে খেলার মাঠ ছেড়ে চলে এল স্কুলের অফিস ঘরের সামনে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরবেলায় একটুও ঘুমোন না। তাই তো দুপুরে সবাই যখন ঘুমোয়, টুংটাং তখন চুপিচুপি দাদুর ঘরে হানা দেয়।

দাদু সারা দুপুর টুংটাংকে দারুণ-দারুণ গল্প শোনান। গল্প শুনতে-শুনতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল চলে আসে। দাদুর বাগানে রোদ্দুর সরে গিয়ে ছায়া পড়ে। দাদু তখন ঝারি দিয়ে ফুল গাছে জল দেন। টুংটাংয়েরও দাদুর সঙ্গে গাছে জল দিতে ভাল লাগে। তখন কিন্তু টুংটাংকে দেখলে কেউ বলবে না ও দুষ্টু মেয়ে। যদিও দাদু সব সময় 'লক্ষ্মী দিদিভাই' বলেই ওকে ডাকেন। একদিন এরকমই এক দুপুরবেলা টুংটাংয়ের মনে কী করি, কী করি ভাব। মায়ের ঘরে মা ঘুমোচ্ছেন। ঠাম্মার ঘরে গিয়ে দেখে সেলাইপত্তর পাশে রেখে ঠাম্মাও ঘুমিয়ে পড়েছেন। টুংটাং যে কী করে! ঠাম্মার সেলাইটা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক এলোমেলো কয়েকটা ফোঁড় দিল।

এই যাঃ! ছুঁচ থেকে সুতো খুলে গেল! সব্বোনাশ! ঠাম্মা ভীষণ রেগে যাবেন! কত কষ্ট করে চোখে মোটা চশমাটা পরে ঠাম্মা ছুঁচে সুতো লাগান। তাড়াতাড়ি করে ছুঁচটা কাপড়ের গায়ে গেঁথে রাখল। যেমন করে ঠাম্মা গেঁথে রাখেন। তারপর টেবিলের উপর দেখল হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স। ছোট্ট-ছোট্ট কাচের শিশিতে মিষ্টি-মিষ্টি গুলি। টুংটাং মাঝে-মাঝেই ঠাম্মার কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে খায়। টপ করে দুটো ওষুধের শিশি বের করে টুংটাং ঢুকিয়ে নিল তার ফ্রকের পকেটে। এগুলো দিয়ে ও পুতুলের খাবার বানাবে। তখন দু'একটা টপাটপ মুখেও পুরে দিতে পারবে।

তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মনে হল একবার দাদুর কাছে যাওয়া যাক। বাড়ির পিছন দিকের বাগানে এসে নিচু পাঁচিল টপকে চলে গেল দাদুর বাড়িতে। ওমা, দরজায় একটা মস্ত তালা। তা হলে দাদু বাড়ি নেই। এই ভরদুপুরে তাকে কিছু না জানিয়ে গেল কোথায় দাদু? নিশ্চয়ই দাদুর বন্ধুর বাড়িতে দাবা খেলতে! "আচ্ছা দেখাচ্ছি! আমাকে গল্প না বলে তোমার দাবা খেলাটাই বেশি বড় হল?" বারান্দা থেকে নেমে ডান দিক দিয়ে বাড়ির ধার ঘেঁষে গেলেই পড়বে দাদুর শোওয়ার ঘরের জানলা। সেখানকার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারলেই ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। দাদু কখনও বৃষ্টির দিন ছাড়া জানলা বন্ধ করে না। বললে বলবেন, "চোর-ডাকাতের ভয়? আমার আছেই বা কী, নেবেই বা কী?"

টুংটাং জানলার পরদা সরিয়ে উঁকি দিল। কেউ নেই। জানলা ঘেঁষে টান-টান করে দাদুর বিছানা পাতা। বেজার মুখে চলেই যাচ্ছিল সে। কী মনে হওয়ায় থামল। তারপর পকেটে থেকে ওষুধের ছোট্ট শিশি দুটো বের করে, আধখানা ইঁটের টুকরো দিয়ে মেরে-মেরে শিশি দুটোকে ভাঙল। তারপর ভাঙা কাচের টুকরো আর একমুঠো ধুলো জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দাদুর বিছানার উপর ছড়িয়ে দিল। "ওঃ, দাদু যখন এসে দেখবে না! দারুণ মজা হবে!" তারপর ছুট্টে চলে গেল বাড়ি। আর যা সে কক্ষনও করে না, স্কুলের হোমওয়ার্ক বের করে করতে লাগল। মা বিকেলে ঘুম থেকে উঠে টুংটাংকে অঙ্ক করতে দেখে তো অবাক!

পরদিন নিয়মমাফিক স্কুলে গেল টুংটাং। সারাদিন বেশ ভদ্র হয়েই থাকল। দুপুরে বাগানে দেখতে পেল দাদুকে। দাদু ওকে দেখে বললেন, "শোনো দিদিভাই, তুমি কি কাল দুপুরে আমার বাড়িতে এসেছিলে?" এই রে! টুংটাংয়ের বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। কোনও রকমে বলল, "না তো।"

"ও তাই বল," দাদু বললেন, "আসলে দুপুরবেলা তো তুমি আমার সঙ্গে গল্প করতে আসো, কাল তো ছিলাম না, তাই বললাম।"

"ও তাই বুঝি?" খুব ভালমানুষের মতো মুখ করে বলল টুংটাং। কিন্তু মনে-মনে প্রচুর কৌতূহল, এর পরে কী হল।

দাদু নিজের মনেই বলতে লাগল, "কাল আমি আমার বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলাম। তার খুব অসুখ। আর ফিরতে তাই দেরি হল। যখন আসছি, তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমি কোনওমতে তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখি লোডশেডিং। কী আর করি। অন্ধকারে মোমবাতি খুঁজে বার করতে হবে। হাতড়ে-হাতড়ে খাটের উপর বসে অন্ধকারটায় একটু ধাতস্থ হতে চেষ্টা করলাম। যেই খাটে হাত রেখেছি, অমনি প্যাট করে হাতে কী যেন ফুটল। কোনও রকমে মোমবাতি খুঁজে আলো জ্বাললাম, দেখি বিছানাময় কাচের টুকরো আর ধুলোবালি। বিকেলের দিকে ঝড় বৃষ্টি হলে ধুলো উড়ে আসতে পারে, কিন্তু কাচের টুকরো কোত্থেকে এল বলো তো? ডান হাতের চেটোয় দেখো বেশ ক'জায়গায় কাচ ফুটে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে। আর অত পাতলা কাচের গুঁড়ো ভিতরে ঢুকে গেলে কী ভয়ানক ব্যাপার হত।"

নিশ্বাস রুদ্ধ গলায় টুংটাং বলল, "তারপর? তুমি কী করলে?"

"কী আর করলাম! ওই রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে ঝেড়েঝুড়ে বিছানা পরিষ্কার করে শোওয়া, কত ঝামেলা বল তো? অন্যমনস্ক ভাবে বিছানায় শুয়ে পড়লে না জানি কী হত। তাই বলছিলাম, তুমি কি কাউকে আসতে দেখেছ? কোনও দুষ্টু ছেলেকে?"

টুংটাং কোনও কথা বলল না। ছুট্টে ঘরে চলে গেল। তারপর দু'-তিনদিন আর দাদুর বাড়িমুখো হয় না। ঠাম্মা একদিন বললেন, "হ্যাঁরে, তুই যে আজকাল ওবাড়ির দাদার বাড়ি যাস না? উনি ডেকে তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।"

টুংটাং বড়দের মতো মুখ গম্ভীর করে বলল, "সময় পাই না তো। আমার এখন অনেক কাজ।"

দিনতিনেক বাদে, টুংটাং রাত্তিরে মায়ের পাশে ঘুমিয়ে রয়েছে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। দাদুর বাড়ির বাগানে দাদু দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সাদা ধবধবে পাজামা পরা, মাথায় সাদা চুল। ধবধবে ফরসা গায়ে অজস্র ফোঁটা-ফোঁটা রক্তবিন্দু। কিন্তু দাদুর মুখখানায় হাসি নেই। কেমন কষ্টমাখা মুখ। টুংটাংয়ের দিকে তাকিয়ে বলছেন, "দিদিভাই, খুব কষ্ট।" টুংটাংয়ের মনে হচ্ছে দাদু মহাভারতের ভীষ্মের গল্প বলেছিলেন। অর্জুনের তির বিঁধে ভীষ্মর চেহারাটা কি দাদুর মতো দেখিয়েছিল? স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল টুংটাং। মা ঘুম ভেঙে বললেন, "কী হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন?"

টুংটাং ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বিকৃত স্বরে বলল, "দাদু।"

পরদিন সকালে স্কুল ইউনিফর্ম পরে টুংটাং ছুটে গেল দাদুর বাগানে। দাদু উবু হয়ে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে দিচ্ছিলেন। টুংটাং ছুটে গিয়ে দাদুর গলা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে উঠল, "তুমি ভাল আছ দাদু, ভাল আছ? আমি আর কখনও এমন দুষ্টুমি করব না।"

দাদু দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে নিলেন টুংটাংকে। শান্ত ভাবে বললেন, "আমি তো তা জানি। তুমি তো আমার লক্ষ্মী দিদিভাই।"

ছবি: সৌমেন দাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফা রা ক পা ও

উত্তর: ৫ মে সংখ্যায়

দু'টি ছবিতে অন্তত আটটি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তারপর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিও।

গত সংখ্যার উত্তর

১) সূর্যের সাইজ় ছোট।

২) বাঁদিকের গাছটা সরে গিয়েছে।

৩) পাশের গাছটা ছোট।

৪) বাড়ির পিছনে একটা গাছ কম।

৫) বাড়ির দরজা নেই।

৬) সামনে বাঁদিকের ঝোপ নেই।

৭) রাস্তায় দাগ নেই।

৮) বাড়ির পাশে ঝোপ নেই।

ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

AMARBOI.COM

সু দো কু

						৯	৬	
		২	১					৫
৫	৩					৪		
			৭				৪	
		১	২		৪	৮		
	৮				১			
		৫					৩	২
৪					৭	৫		
	৬	৩						

৫	৪	৭	৯	১	৮	৬	২	৩
৩	৯	৬	৪	৫	২	৭	১	৮
১	৮	২	৩	৭	৬	৯	৪	৫
৯	৫	৪	১	৮	৭	৩	৬	২
৬	৭	৮	২	৯	৩	৪	৫	১
২	১	৩	৫	৬	৪	৮	৭	৯
৪	৩	৯	৬	২	৫	১	৮	৭
৮	৬	৫	৭	৩	১	২	৯	৪
৭	২	১	৮	৪	৯	৫	৩	৬

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমন ভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকী, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবাব চাই

১। পৃথিবীর সব চেয়ে আস্তে উড়তে পারা পাখি কোনটি?

২। এক সঙ্গে অনেকগুলো প্যাঁচাকে আমরা কী বলি?

৩। সবচেয়ে বড় বাসা বানায় কোন পাখিটি?

সঠিক উত্তরদাতা

সৃজন সাহা, *পঞ্চম শ্রেণি, বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়;* **কৃষ্টি বিশ্বাস,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস হাই স্কুল, দমদম;* **চন্দ্রাপীড় সর,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, বর্ধমান পৌর উচ্চ বিদ্যালয়;* **অর্ণব চোংদার,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়।*

৫ এপ্রিল সংখ্যার 'সবজান্তা'র উত্তর

১. ৫ রানে।
২. আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম, কলম্বো।
৩.শ্রীলঙ্কা, ২৬০ রান।
৪. ক্রিস গেল (৬টি)।
৫. তিলকরত্নে দিলশান (৩১৭ রান)।

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. যুবরাজ সিংহ (৩৬ রান), ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে।
২. ১০টি।
৩. ভারত।

স ব জা ন্তা

বিভিন্ন দেশের জানা না-জানা নানা পাখিদের নিয়েই এবারের 'সবজান্তা'।

১ কোন প্রজাতির পেঙ্গুইন সবচেয়ে জোরে সাঁতার কাটতে পারে?

২ 'বাডম্যান অফ ইন্ডিয়া' নামে কোন পক্ষী বিশারদ বিখ্যাত?

৩ কোন পাখি লাথি মেরে শত্রুকে মেরে ফেলতে পারে?

৪ হামিংবার্ড পাখি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় কতবার ডানা ঝাপটায়?

৫ কোন পাখি আত্মরক্ষার জন্য বমি করে?

শিলাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

AMARBOI.COM

প্লাস্টিকের শিশি দিয়ে বানাও ফুল

নি জে র হা তে

উপকরণ: প্লাস্টিকের খালি শিশি, কাঁচি, ফুরিয়ে যাওয়া জেল পেনের রিফিল, অ্যাক্রিলিক রং।

কীভাবে বানাবে:

জোয়ানের শিশির পিছন দিকটা সুন্দর করে কাঁচি দিয়ে কেটে নাও। ছবিতে দেখানো রেখা বরাবর শিশির গা-টা ফালি-ফালি করে কাটো। এমন ভাবে কাটতে হবে যাতে প্রত্যেকটা ফালি সমান মাপের হবে। এবার ফালিগুলো

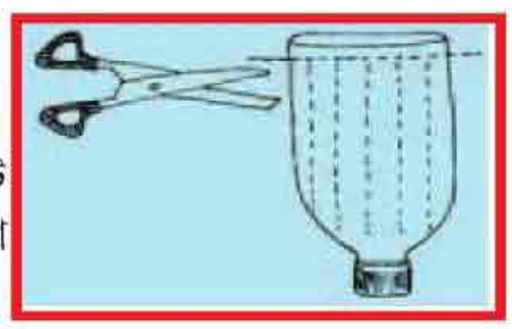

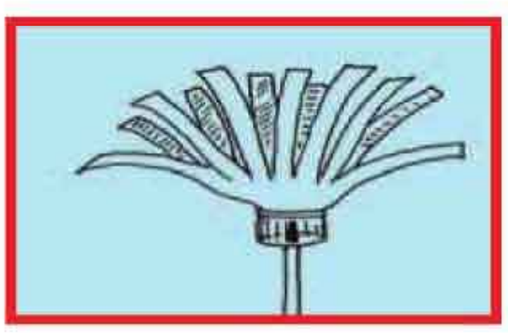

ছড়িয়ে দিলেই দেখবে এটা একটা ফুলের পাপড়ির আকার নিয়েছে। শূন্য রিফিলের মুখের দিকটা শিশির ঢাকনার মাঝখানে ফুটো করে ঢুকিয়ে দিলেই ফুলের সম্পূর্ণ চেহারাটা পাওয়া যাবে। শেষ পর্যায় রং করা। অ্যাক্রিলিক রং দিয়ে তোমার ইচ্ছেমতো রং করে নাও।

গুরুপ্রসাদ দে
ফোটো: প্রদীপ আদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দসন্ধান

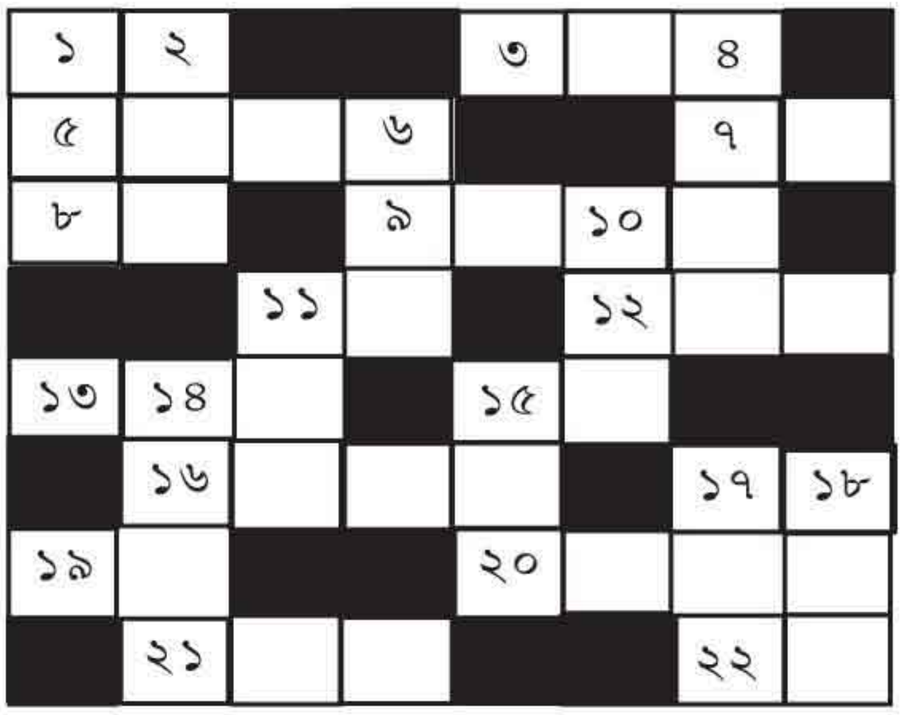

পাশাপাশি

১। এর সঙ্গে পা জুড়লেই যেটি হয়, সেটি চড়ে আগেকার দিনে অনেক দূরে-দূরে যাওয়া যেত।
৩। দাবি করার নির্দিষ্ট সময় উতরে গিয়েছে এমন।
৫। ভীতিপ্রদ, ভীষণ।
৭। কথা, উক্তি। সরস্বতী।
৮। সাল, বছর।
৯। আড়ম্বরপূর্ণ।
১১। জঙ্গল।
১২। গাছের ছাল।
১৩। জলে জন্মায় যে।
১৫। কবিতায় 'বলব'।
১৬। বর্ধমানের একটি শহর।
১৭। হিরে, পান্নার মতো পাথর ওজনের একক।
১৯। তাঁত বোনার যন্ত্র।
২০। রোগী বা ভি আই পি গাড়ির মাথায় এটি জ্বলে।
২১। ব্যাধ।
২২। শ্রেষ্ঠ।

উপর-নীচ

২। চোখ।
৪। দিনের আলো।
৬। পাইন গাছের ছাল থেকে তৈরি আঠা। এটি বেহালা, এসরাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ছড়ে ঘষা হয়।
১০। এই মোগলাই খাবারের কদর বিশ্বজোড়া।
১১। ধীরে চলা বড় নৌকো।
১৪। রাম-সীতার দুই ছেলে।
১৫। তেতো সবজি বিশেষ।
১৭। বীণা জাতীয় আফগান বাদ্যযন্ত্র।
১৮। একটি পাখি। এটি শিকার করা হত একসময়ে।

গত সংখ্যার সমাধান

স	হ	চ	রী		পা	ব	ক
ধ	ক	ল		হ	ল	ধ	র
বা		ন	ধ	র			ক
	ব	স	ন		চি	তো	র
চ	ড়ু	ই		স	ত্ত	র	
রা			ভা	র	বি		বি
চ	ম	চ	ম		কা	গ	জ
র	সি	ক		টা	র	জা	ন

শালুক

পেটেখিল

● রাজু একটা মাছের দোকানে গিয়ে বলল, "আচ্ছা, আপনারা জ্যান্ত হাঙর এনে দিতে পারেন আমায়?"
মাছওয়ালা অবাক হয়ে বলল, "হাঙর মাছ দিয়ে কী করবে?"
রাজু উত্তর দিল, "আমার বাড়ির বিড়ালটা অ্যাকোয়ারিয়ামের সব গোল্ডফিশ খেয়ে ফেলেছে। আমি ওকে একটা শিক্ষা দিতে চাই।"

● দুই বন্ধু জঙ্গলে গিয়েছে। হঠাৎ ওরা দেখতে পায় একটা ভল্লুক আসছে। প্রথম বন্ধু তাড়াতাড়ি স্পোর্টস শু পরে নেয়। সেটা দেখে দ্বিতীয় বন্ধু বলে, "আরে, ভল্লুক কত জোরে দৌড়তে পারে জানিস? তুই কি ভাবছিস স্পোর্টস শু পরে ভল্লুককে দৌড়ে হারাতে পারবি?"
প্রথম বন্ধু জবাব দেয়, "তুই কি ভাবছিস আমি ভল্লুকের চেয়ে জোরে দৌড়তে চাইছি? না রে, ভল্লুক তাড়া করলে আমি তোর চেয়ে জোরে দৌড়তে চাইছি।"

● একটা ইঁদুর তার বাচ্চাকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল। হঠাৎ একটা বিড়াল আক্রমণ করে দু'জনকে। ইঁদুরটি গলা ফুলিয়ে "ঘেউ ঘেউ," করে ডেকে ওঠে। সেই ডাক শুনে বিড়ালটি তিন লাফে পালিয়ে যায়। ইঁদুর তখন তার বাচ্চাকে বলে, "দেখেছিস অন্য জাতের ভাষা শেখাটা কত জরুরি!"

ছবির ধাঁধা

১। তাঁর জন্ম ১৯৮৩ সালের ২৭ জুন।

২। টেস্ট বোলিংয়ে এই মুহূর্তে তাঁর র‍্যাঙ্ক এক নম্বর।

৩। তিনি ডানহাতি ফাস্ট বোলার।

৪। ২০১৩ সালে 'উইজ়ডেন ক্রিকেটার্স অফ দা ওয়ার্ল্ড'-এর তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে।

৫। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা দলের হয়ে খেলে থাকেন।

ছবির ধাঁধার উত্তর: বারাক ওবামা

২৭ এপ্রিলের মধ্যে জানাও ছবিটি কার। খামের উপর 'ছবির ধাঁধা' কথাটি লিখবে। আগে পৌঁছনোর ভিত্তিতে প্রথম পাঁচজন সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে ৫ মে সংখ্যায়।

গত সংখ্যার প্রথম পাঁচজন সঠিক উত্তরদাতা

১. **পরমার্থ ঘোষ,** কোতলপুর, বাঁকুড়া।
২. **মঞ্জিমা মাইতি,** পূর্ব মেদিনীপুর।
৩. **রিমিল বারাক মান্ডি,** পশ্চিম মেদিনীপুর।
৪. **সৌমিক রায়,** উত্তর দিনাজপুর।
৫. **অঙ্কিতা গায়েন,** কলকাতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

■ আমি ক্রমশ মোটা হয়ে যাচ্ছি। বন্ধুরা খুব খ্যাপায়। আর একটা সমস্যা, হাজারবার পড়লেও পড়া আমার কিছুতেই মুখস্থ হয় না। বন্ধুরা বলে লেখাপড়ায় আমার নাকি একটুও মন নেই।

অস্মিতকুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় শ্রেণি, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, হুগলি।

তোমার ক্রমশ মোটা হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা বাড়ির লোকের চোখে পড়ছে না, নাকি তুমি এটা নিয়ে একটু বেশি চিন্তা করছ ইদানীং? তোমার যা বয়স তাতে একটু-আধটু মোটা হলে ক্ষতি কী? কিন্তু দেখতে হবে, এর কারণে তোমার অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা হচ্ছে কিনা। অনেক সময় থাইরয়েড হলে মোটা হয়ে যাওয়া, অমনোযোগিতা, ঘুম পাওয়ার মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়।

■ **আমি গান খুব ভালবাসি। বড় হয়ে রকস্টার হতে চাই। কিন্তু কারও কাছ থেকে সেরকম বিশ্বাস, ভরসা পাচ্ছি না। তাঁদের মতে, এত উঁচু ভাবনা, স্বপ্ন আমার দ্বারা পূরণ হবে না। সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনের সব আশা, বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু আমি ইংরেজি গান গাওয়া কখনও ছাড়তে পারব না।**

শ্রেয়সী রায়

নবম শ্রেণি, চিন্তামণি চমৎকার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মালদা।

ছাড়তে তোমায় কে বলেছে? রকস্টার হতে গেলে গান তো গেয়েই যেতে হবে, তবে না কোনও একদিন তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে! কিন্তু মনে রেখো, পথটা দীর্ঘ, সমস্যায় ভরা। শেষ পর্যন্ত তোমার পক্ষে লড়াইটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। আমার মনে হয়, সেই কারণেই বাড়ির লোক গান নিয়ে তোমাকে বেশি উৎসাহ বা ভরসা দিতে চাইছেন না। আপাতত তুমি লেখাপড়ার পাশাপাশি গানটাও চালিয়ে যাও।

■ **আমার বই পড়ার উৎসাহ খুব বেশি। বাড়িতে এত বই জমেছে যে, ছোট একটা লাইব্রেরি খুলে ফেলা যায়। ইদানীং আমার বই পড়ার নেশা এত বেড়ে গিয়েছে যে, মা-বাবা রাগ করছেন। কী করব?**

অর্ক রায়

চতুর্থ শ্রেণি, পাঠভবন, কলকাতা।

লেখাপড়া শিকেয় তুলে তুমি শুধুই যদি বাইরের বই পড়তে থাকো, তা হলে বকুনি খাওয়া ছাড়া পথ নেই। দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স আনতে হবে। এখন থেকে প্রতিজ্ঞা করো, স্কুলের পড়া শেষ করে তবেই তুমি গল্পের বইয়ের দিকে হাত বাড়াবে।

■ **আমি প্রতি বছর এক থেকে তিনের মধ্যে থাকি। ক্লাস ওয়ান থেকে এটাই হয়ে আসছে। আমার সমস্যা হাতের লেখা নিয়ে। দ্রুত লিখতে গেলেই লেখা খারাপ হয়ে যায়। পড়তে অসুবিধে হয়।**

রায়হান হোসেন

পঞ্চম শ্রেণি, পূর্ব বারাসাত আদর্শ বিদ্যাপীঠ।

এখন থেকে হাতের লেখা ভাল করার দিকে নজর দাও। প্রতিদিন বই দেখে অন্তত পাঁচ পাতা করে লেখার চেষ্টা করবে। প্রথম পাতা লেখার জন্য যদি দশ মিনিট সময় নাও, দ্বিতীয় পাতার বেলায় সেটা কমে দাঁড়াবে আট। এই ভাবে শেষ পাতার বেলায় সময় নেবে পাঁচ মিনিট। কিছুদিন প্র্যাকটিস করলে দেখবে, কম সময়ে লেখার ব্যাপারটা অভ্যেস হয়ে যাবে।

■ **ফোন, ইন্টারনেট, বন্ধুবান্ধব, টিভি এইসবের মধ্যে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছি। লেখাপড়ায় মন বসছে না। ফলে পরীক্ষার ফল খারাপ হচ্ছে। অথচ সামনের বছর আমার মাধ্যমিক। তা ছাড়া একটুতেই রেগে যাচ্ছি। নিজেকে কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারছি না। কীভাবে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসব?**

অনন্যা কর

দশম শ্রেণি, ছাতনা বাসুলী বালিকা বাণীপীঠ, বাঁকুড়া।

তুমি নিজেই যখন ধরতে পারছ তোমার ত্রুটি কোথায়, তখন সেটা শোধরানোর চেষ্টা করছ না কেন? ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'টু মাচ অফ এনিথিং ইজ় ব্যাড'। তোমার ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। যা করছ, সেটাকে এমন একটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছ যে, সামলাতেই পারছ না। এতে ক্ষতি তোমার। লেখাপড়ার সময়ে টান পড়ছে। ঠিকমতো পড়া তৈরি হচ্ছে না। পিছিয়ে পড়ছ অন্যদের চেয়ে। একটুতেই রেগে যাচ্ছ খানিকটা এই কারণে।

ঘোষণা

তোমাদের যে-কোনও সমস্যার সমাধান পেতে চাইলে চিঠি লিখে জানাতে পার আমাদের। সমাধান করবে আনন্দমেলা।

ঠিকানা: আনন্দমেলা 'করবে কী' বিভাগ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা- ৭০০০০১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাডমিন্টনকে মর্যাদাজনক খেলা হিসেবে দেশের মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনিই। সোনার এই মেয়েই অলিম্পিকে ভারতকে ব্যাডমিন্টনে প্রথম ব্রোঞ্জ মেডেলটি থামেনি। ২০০৮ সালে পুণেতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে গার্লস সিঙ্গলসে প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে সোনা জেতেন তিনি। দু'বছর পর ২০১০ সালে দিল্লির কমনওয়েলথ গেমসেও সাইনা সিঙ্গলসে জেতেন ব্রোঞ্জ পদক, কিন্তু তবুও দেশবাসী হতাশ! কারণ? সাইনার যা যোগ্যতা, তাতে নাকি সোনা জিতে ফিরতেই পারতেন তিনি। পদকপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে সাইনা হয়ে উঠলেন প্রথম ভারতীয় ব্যাডমিন্টন

ফর্মের খোঁজে সাইনা

সম্প্রতি সাফল্য থেকে সাইনা নেহওয়ালকে দূরে সরে যেতে হচ্ছে বারবার। কারণ কি শুধুই অফ ফর্ম, নাকি চোটই এই ব্যর্থতার মূলে? কারণ খুঁজলেন অচ্যুত দাস

এনে দিয়েছিলেন। জন্মসূত্রে হরিয়ানার এই মেয়ের নাম সাইনা নেহওয়াল, সম্প্রতি চোট-আঘাতে জর্জরিত হয়ে একের পর-এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যাঁর ব্যর্থতা নিয়েই ক্রীড়াজগতে উঠছে নানা প্রশ্ন। তবে কি সাইনার জয়যাত্রার এখানেই ইতি? নাকি আবার পুরনো ফর্মে ফিরবেন তিনি?

ছোট থেকেই ব্যাডমিন্টনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন সাইনা। ফল মিলতেও দেরি হয়নি। ২০০৪ ও ২০০৫ সালে পরপর দু'বছর জুনিয়র লেভেলে এশিয়ান স্যাটেলাইট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট জেতার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি। পরের বছর ফিলিপিন্‌স ওপেন জিতে বিশ্বের নজর কাড়েন সাইনা। তিনিই প্রথম ভারতীয় মেয়ে, যিনি ওরকম একটি চারতারা টুর্নামেন্ট জেতেন। তারপর সেই বিজয়রথ লম্বা সময়ের জন্য আর উইমেনস সিঙ্গলসে সোনা জেতেন সাইনা। ওই বছরই দিল্লিতে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে জেতেন ব্রোঞ্জ পদক।

এছাড়াও হায়দরাবাদ হটশটস দলের অধিনায়িকা ততদিনে আন্তর্জাতিক সার্কিটে তুখোড় পারফর্ম্যান্সে নজর কেড়ে নিয়েছেন সারা বিশ্বের। তাঁকে নিয়ে প্রত্যাশার পারদ ততদিনে যে কতটা চড়েছে, তার নমুনা জানা যাক এবার। ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিকে প্লেয়ার, যিনি বিজ্ঞাপন জগতেও আমন্ত্রণ পেলেন। কিন্তু এহেন তারকা খেলোয়াড়ের ফর্ম ইদানীং বেশ খারাপ। গত বছর পেশাদার টুরে একটিও খেতাব জিততে পারেননি সাইনা। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে 'ইন্ডিয়ান গ্রাঁ প্রি গোল্ড'-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বটে, কিন্তু তার ফাইনালে তেমন একটা লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়নি সাইনাকে। ওই একটি টুর্নামেন্ট বাদ দিলে, অল ইংল্যান্ড ওপেনই হোক বা সুইস ওপেন, সাইনা ব্যর্থ হয়েছেন সবেতেই। এবছরই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে নতুন দিল্লিতে ইন্ডিয়ান ওপেন সুপার সিরিজেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

মাত্র ২৪ বছর বয়সেই এমন অবস্থা কেন সাইনার? তাঁর মেন্টর গোপীচন্দ বা তাঁর আইডল, ইন্দোনেশিয়ার তৌফিক হিদায়েত, এবিষয়ে প্রশ্ন করলে সকলের কাছেই একই উত্তর পাওয়া গিয়েছে, পায়ের চোটের পর পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে তাঁর। পুরনো ছন্দ এবং গতি ফিরে পাওয়ার জন্যও দরকার আরও সময়ের। সেই সময় কত তাড়াতাড়ি আসে, আপাতত সেই অপেক্ষায় ভারতের সঙ্গে-সঙ্গে সারা বিশ্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতাব জিতলেন হিঙ্গিস

অবসর ভেঙে কোর্টে ফিরে খেতাব জিতে নজর কাড়লেন প্রাক্তন বিশ্বের একনম্বর মহিলা টেনিস তারকা মার্টিনা হিঙ্গিস। মিয়ামির সোনি ওপেনে মেয়েদের ডাবলসে জার্মানির সাবিন লিজ়িকিকে সঙ্গী করে রুশ জুটি মাকারোভা-ভেসনিনাকে হারিয়ে কেরিয়ারের ৩৮তম ডব্লিউ টি এ ডাবলস খেতাব জিতলেন

মার্টিনা। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে তিনি জিতেছিলেন ৩৭টি ডাবলস খেতাব। সাত বছর আগে দোহায় শেষ কোনও খেতাব জিতেছিলেন। এর পরই অবসর নিয়ে নেন পাঁচটি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী এই সুইস টেনিসতারকা। গত বছর সেই অবসর ভেঙে ডাবলস খেলতে আবার কোর্টে ফিরেছেন। ৩৩ বছর বয়সে এসে নতুন করে খেতাব জিতে তিনি স্বভাবতই ভারী খুশি। মার্টিনার কথায়, "অনেকদিন পর এই জয়টা সত্যিই রোমাঞ্চকর লাগছে।" কামব্যাক করার পর এবার ডাবলসে ধারাবাহিক ভাবে আরও জয় চান মার্টিনা।

অসি মেয়েদের বিশ্বজয়

মেয়েদের ক্রিকেটে ইতিহাস গড়ে ফেলল অস্ট্রেলিয়া। এবার নিয়ে পরপর তিনবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে হ্যাটট্রিক করল তারা। এ ব্যাপারে দেশের পুরুষ ক্রিকেটারদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা। অসি মেয়েরা তিন-তিনবার চ্যাম্পিয়ন হলেও ছেলেরা আজও ক্রিকেটের এই ট্রোফিটা ঘরে তুলতে পারেননি। এবারও ছেলেরা যখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন, তখন ঢাকার মিরপুর স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডকে ছয় উইকেটে হারিয়ে টানা তৃতীয়বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে নেন মেগ ল্যানিং, শারা কোয়েট, এলিস পেরিরা। প্রথমে ব্যাট করে ইংল্যান্ড আট উইকেটে ১০৫ রান করে। ১৫.১ ওভার ব্যাট করে চার উইকেটে জয়ের ১০৬ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায় অস্ট্রেলিয়া। অসি অধিনায়ক ল্যানিং করেন সর্বোচ্চ ৪৪ রান। তিন উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা ক্রিকেটার হন কোয়েট।

বিশ্বকাপে অনিশ্চিত ক্লোসে

ব্রাজ়িল বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে, ততই বিশ্বের তারকা ফুটবলারদের মধ্যে বাড়ছে উৎসাহ। এর মধ্যে চোট-আঘাত সমস্যাও ভাবাচ্ছে অনেককে। যেমন জার্মান তারকা মিরোস্লাভ ক্লোসের কাছে আসন্ন বিশ্বকাপ অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। লাজ়িওর স্ট্রাইকার ক্লোসে বাঁ পায়ে চোট পাওয়ায় একমাস তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। অথচ সিরি এ লিগে ২২ ম্যাচে সাত গোল করে, বিশ্বকাপে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন বছর পঁয়ত্রিশের এই ফুটবলার। বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজ়িলের রোনাল্ডোর সর্বাধিক গোলের (১৫) রেকর্ড ভাঙার হাতছানি তাঁর সামনে। ১৪ গোল করে কিংবদন্তি জার্মান স্ট্রাইকার গার্ড মুলারের সঙ্গে একই জায়গায় রয়েছেন তিনি। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে কতটা সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন ক্লোসে! তিনি কি ভাঙতে পারবেন রোনাল্ডোর রেকর্ড? সময়ই বলবে সে কথা।

যুব অলিম্পিকে সুতীর্থা

বাংলার টেবিল টেনিসের নতুন তারকা সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় এবার দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যাবেন টেবিল টেনিসের যুব অলিম্পিকে। আগামী অগস্টে চিনের নানজিং শহরে বসবে অনূর্ধ্ব ২১ বছরের এই প্রতিযোগিতা। নৈহাটি ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনে কোচ মিহির ঘোষের কাছে সুতীর্থার টেবিল টেনিসে হাতেখড়ি। ২০০৯ সালে জাতীয় সাব-জুনিয়র খেতাব জয়ের পর গত বছর জাতীয় জুনিয়র খেতাব জয় করে আশা জাগিয়েছেন সুতীর্থা। ইতিমধ্যে বিদেশের বেশ কিছু টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়ে সাফল্য নিয়ে ফিরেছেন দ্বাদশ শ্রেণির এই ছাত্রী। স্লোভাকিয়ায় জিতেছিলেন ত্রিমুকুট। ব্যাঙ্ককে যুব অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জনের লড়াইয়ে জিতে পৌলমী ঘটকের ভক্ত সুতীর্থার চোখে এখন আরও বড় জয়ের স্বপ্ন।

চন্দন রুদ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

২

৩

৪

৫

১				
২				
৩				
৪				
৫				

(সমাধান ৫ মে সংখ্যায়)

ছবিতে শব্দ খোঁজো

পাঁচটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পরপর খোপে লিখে ফ্যালো। এবার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। বলতে পার, কী সেই শব্দ? পাঁচটি জিনিসের নাম পাশাপাশি বাংলায় লিখে ফ্যালো, যাতে ষষ্ঠ জিনিসটির নাম উপর-নীচ করে পড়া যায়।

এবারের সঙ্কেত: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা।

ম	ট	র	শুঁ	টি
হা	বি	ল	দা	র
ভা	রো	ত্ত	ল	ন
র	ন্ধ	ন	শা	লা
ত	ব	লা	বাঁ	য়া

গত সংখ্যার সমাধান:
ম হা ভা র ত

AMARBOI.COM

÷ × + −

Go Figure

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। সবক'টি খোপ ভরে গেলে, অঙ্কটি কষলে তার ফল ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি হওয়া চাই। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবে। তবে মনে-মনে তোমরা বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তরও হতে পারে।

সহজ

							= ২
১		২		৪		৪	

মাঝামাঝি

							= ২৩
১		৫		৮		৮	

কঠিন

							= ৭২
৩		৬		৭		৯	

(সমাধান ৫ মে সংখ্যায়)

গত সংখ্যার সমাধান:

সহজ: ৮×২×৯×৬=৮৬৪

মাঝামাঝি:(২×৭-৬)×৬=৪৮

কঠিন:(৩×৫+১)÷৮=২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহিণীর সাথী

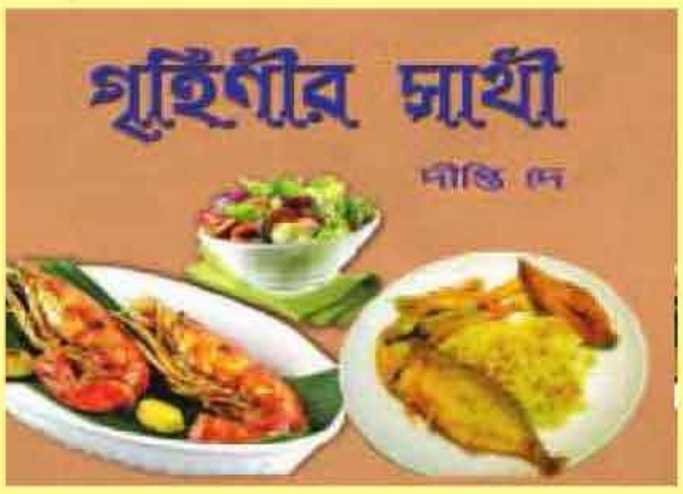

দীপ্তি দে 100/-

কিশোর জ্ঞান বিচিত্রা

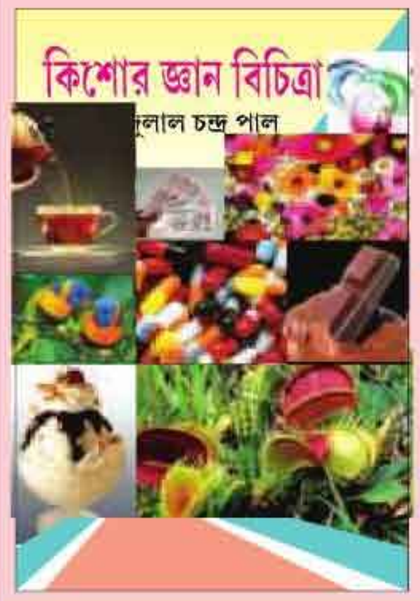

ড. দুলাল চন্দ্র পাল 50/-

ভেষজ গাছপালায় সহজে রোগ নিরাময়

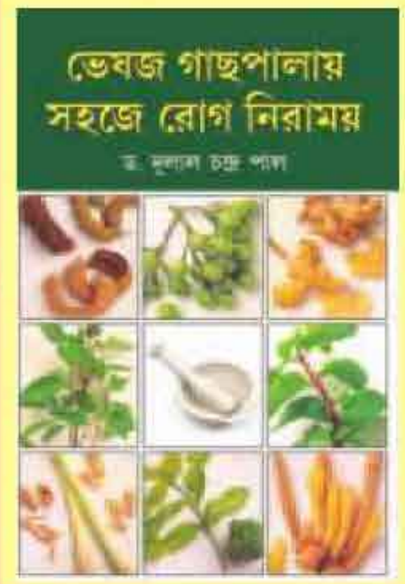

ড. দুলাল চন্দ্র পাল 80/-

- নিজের দেশকে জানো — 30/-
  আবীর চট্টোপাধ্যায়
- মা ফাতেমার ছেলেরা — 18/-
  শৈলেন সরকার
- আমাদের সম্পর্ক — 20/-
  অজন্তা রায়
- গুলাই আর সেই পাখিটা — 15/-
- টুয়া ও চারটে বেড়ালছানা — 20/-
- ছোটোদের বেগম রোকেয়া — 15/-
- ছোটোদের ভগিনী নিবেদিতা — 18/-
  সোমা মুখোপাধ্যায়
- সহজে শেখো ইংরাজি — 20/-
  স্বাতী বসু
- স্মরণীয় ঘটনা স্মরণীয় দিন — 20/-
  অরূপরতন আচার্য
- আমাদের পরিবেশ ও আমরা — 20/-
  মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়
- হাসিকান্নার দিন ও অন্যান্য গল্প — 100/-
  বাণী রায়
- মিমিদের বাড়িতে বাঘ — 125/-
- গল্পের গ্যালারী — 100/-
- কুড়িয়ে পাওয়া গল্প — 80/-
  শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়
- ল্যাজকাহিনী — 25/-
- বনমুলুকের উলুক ঝুলুক — 25/-
  সরল দে
- ছন্দে ছড়ায় সমাজবন্ধু — 30/-
  প্রদীপ আচার্য

- মিনুর অতিথি — 15/-
- ঝিলমিল ও কাঠবুড়ো — 15/-
- গুলতির লাল ঘুড়ি — 15/-
  সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
- গল্পমালা — 35/-
  আশিস খাস্তগীর
- রাজপথের গাছেরা — 30/-
- সাইবেরিয়ার কালো চিতা — 30/-
- ফুলটুসি আর কাঠবেড়ালি — 35/-
- মেঘ কুয়াশার লুকোচুরি — 30/-
- দেখবো এবার জগৎটাকে — 25/-
- সভ্যতার দিক্‌চিহ্ন — 35/-
- কথামালার গল্প — 35/-
- সোনা রুপো হিরে মানিক — 25/-
- উপনিষদের গল্প — 25/-
- ক্যাপ্টেন পেড্রোর বন্ধু — 30/-
  পৃথ্বীরাজ সেন
- খুশির ঝিলিক — 90/-
- সইদুনের গল্প — 60/-
- নির্বাচিত আরব্য কাহিনি — 50/-
- নির্বাচিত পঞ্চতন্ত্রের গল্প — 55/-
- নির্বাচিত জাতক কাহিনি — 70/-
- নির্বাচিত ঈশপের গল্প — 70/-
  সঞ্জিতকুমার সাহা
- ঠাকুরমার কীর্তি ও অন্যান্য গল্প — 30/-
  শ্যামলেন্দু মজুমদার
- ভূত যদি তোমাকে ধরে — 50/-
  সুবিমল সরকার

- সেরা পঁচিশ — 120/-
  অপূর্ব দত্ত
- অল্প-স্বল্প বাঘের গল্প — 60/-
- হিতোপদেশের নতুন গল্প — 60/-
  বিপ্লব মজুমদার

সমাজ ও পরিবেশ

- দূষণের ক্ষয়ক্ষতি — 50/-
- দূষিত হচ্ছে পৃথিবী — 50/-
- সবাই মিলে ভাবতে হবে — 50/-
- লড়াই করে বাঁচতে হবে — 50/-
  অনিন্দ্য ভুক্ত
- সেরা পঞ্চাশ — 250/-
  গ্রন্থনা ও সম্পাদনা ঃ বারিদবরণ ঘোষ
- সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ — 160/-
  ড. তারকনাথ ভট্টাচার্য
- শেক্সপীয়ার চয়নিকা — 45/-
  বিখ্যাত Lamb's Tales-এর অনুবাদ
  ড. প্রণব ভট্টাচার্য

- আলপনা (১) — 25/-
- আলপনা (২) — 25/-
- বাংলার আলপনা (১) — 40/-
- বাংলার আলপনা (২) — 50/-
- মেহেন্দি — 50/-
  পার্থপ্রতিম বিশ্বাস
- JAMINI ROY — 60/-
- MANGALIK — 48/-
- EMBROIDERY — 40/-
  Partha Protim Biswas

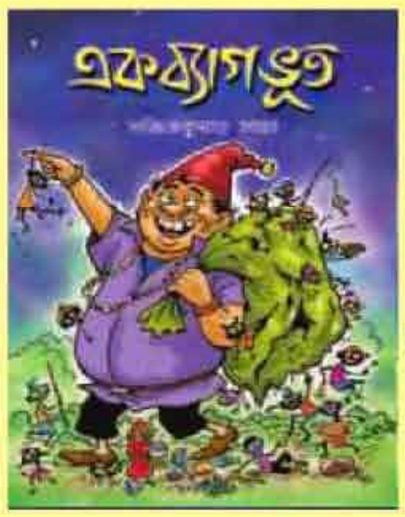

এক ব্যাগ ভূত
সঞ্জিতকুমার সাহা
60/-

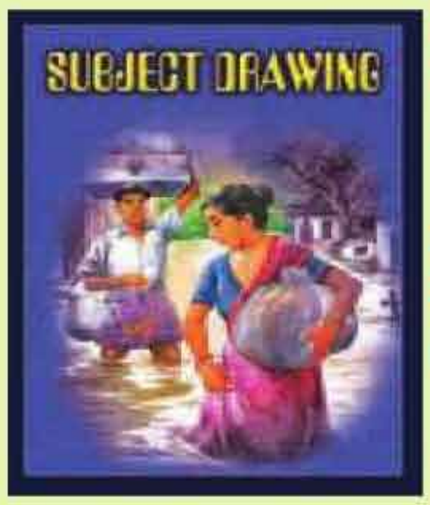

SUBJECT DRAWING
PARTHA PORTIM BISWAS
50/-

নামকরণ অভিধান
এ. কে. কাজল
120/-

গ্রন্থমিত্র
১বি, রাজা লেন, কলকাতা-৯

পরিবেশক
মিত্রম
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

Phone : (91-33) 2219 1595 / 6539
E-mail : pmitram@gmail.com
Website : www.progressivepublishers.co.in

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ANANDAMELA 20 APRIL 2014 REGISTERED KOL RMS/236/2013-2015, RNI NO.27057/75 INR 15.00

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~